বুদ্ধ ও বৌদ্ধ

সংকলন
ড· বারিদবরণ ঘোষ

করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ ১লা বৈশাখ—১৩৪৯

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রণে ঃ
প্রিণ্টেক্স
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
শংকরপ্রসাদ মজুমদার

শ্রীহেমেন্দ্রবিকাশ চৌধুরী

প্রীতিমত্মেষু

বারিদবরণ ঘোষ

॥ সূচীপত্র ॥

গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বৌদ্ধমত

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ-প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের পূর্বেও বৌদ্ধধর্ম ছিল, ইহা বর্তমান বৌদ্ধগণ যেমন স্বীকার করেন, বৈদিক ধর্মাবলম্বীগণও তদ্রূপ স্বীকার করেন। বৌদ্ধ মতে এই বৌদ্ধধর্ম অনাদি ; বৈদিক মতেও ইহা অনাদি। তবে প্রভেদ এই যে, বৈদিক মতে এই বৌদ্ধধর্ম বেদে পূর্বপক্ষরূপে উক্ত হইয়াছে, আর সেই বেদ অনাদি বলিয়া সেই পূর্বপক্ষস্থানীয় বৌদ্ধধর্মও অনাদি বলা হয় ; কিন্তু বৌদ্ধগণ সকলে স্বীকার করেন না যে, তাঁহাদের ধর্ম বেদে কোনরূপেও উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধগণের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং তপস্যা দ্বারা যথার্থ সত্য লাভ করিয়াছেন, আর এইরূপে সত্য লাভ তাঁহার পূর্ববর্তী ২২শ জন বুদ্ধও করিয়া গিয়াছেন ; আর এই প্রকারেই বৌদ্ধমত অনাদি। বৌদ্ধমতের অনাদিত্ব বিষয়ে বৈদিক ও বৌদ্ধমতের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। বস্তুতঃ প্রকারান্তরে অনেক বৌদ্ধই স্বীকার করেন যে, বৌদ্ধমত বেদ-মধ্যেও আছে। অবশ্য এই পক্ষের কথার প্রমাণ খুব প্রসিদ্ধ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও, ইহা যে নাই তাহা নহে। অথচ খৃঃ ৭।৮ শতাব্দীর পণ্ডিত শান্তরক্ষিত কর্তৃক রচিত তত্ত্ব-সংগ্রহ গ্রন্থে ৩৫১১-৩৫১৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, বেদের নিমিত্ত শাখাতে এই সর্বজ্ঞ গৌতম বুদ্ধেরই কথা কথিত হইয়াছে—ইত্যাদি ; এ স্থলে অনাদি বেদ-মধ্যে সর্বজ্ঞ বুদ্ধের কথা আছে বলায়, প্রকারান্তরে বৌদ্ধমত বেদ-মধ্যেও আছে, ইহা স্বীকার করা হইল। অবশ্য বেদ অনাদি কিনা, এবং স্বয়ং তপস্যা দ্বারা যথার্থ সত্য লাভ করা যায় কিনা,—ইত্যাদি কথা বিচার-সাপেক্ষ। এখন এখানে উত্থাপন না করিয়া গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বৌদ্ধমত সত্তা উভয় সম্প্রদায় স্বীকার করেন বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধে বৈদিক দার্শনিক গ্রন্থ হইতে সেই পূর্ববর্তী বৌদ্ধমত সত্তা প্রদর্শন করার প্রয়াস করিব। বস্তুতঃ বৈদিক ছয়খানি প্রসিদ্ধ দর্শনেই এই নিদর্শন আছে, দেখা যায়। এ বিষয়ে বর্তমান সুধীবর্গের তাদৃশ দৃষ্টি পতিত হয় নাই বলিয়া এ বিষয়টীর তত প্রচার নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে যতটা পতিত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রচারিত হইয়াছে যে, বৈদিক দর্শন ছয়খানিতে বৌদ্ধমত থাকায়, উক্ত দর্শনগুলিই গৌতম বুদ্ধের পরবর্তী, অথবা উক্ত দর্শনসমূহে উক্ত বৌদ্ধমতের উল্লেখ অংশটিই পরবর্তী বা প্রক্ষিপ্ত। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত দর্শনগুলিতে যে বৌদ্ধমত আছে, তাহা বর্তমান বৌদ্ধমতের সহিত

ঠিক ঐক্য হয় না বলিয়া, উক্ত দর্শনকারগণ বৌদ্ধমতে অনভিজ্ঞই ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের কল্পিত বা বিকৃত বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন—ইত্যাদি। কিন্তু যতই আলোচনা করা যাইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও বৌদ্ধ মত ছিল, আর তাহা বেদে পূর্বপক্ষ-রূপে উক্ত হইয়াছে। সেই মত যখন প্রবল হয়, তখন ঋষিগণ নিজ নিজ দর্শনে তাহা খণ্ডন করেন; এবং গৌতম বুদ্ধ সেই খণ্ডিত বৌদ্ধমতের দুষ্টাংশ বর্জন করিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজ অনুভব ও যুক্তির দ্বারা পুষ্ট করিয়া সেই প্রাচীন বৌদ্ধমত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন মাত্র। অতএব এ বিষয়ে সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে উৎসাহী হইলাম। ভগবান্ জৈমিনি পূর্বমীমাংসা দর্শনে ধর্মের প্রমাণ নিরূপণ করিতে যাইয়া প্রত্যক্ষকে ধর্মের অপ্রমাণ বলিয়াছেন। যথা—

"প্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ।" ১।১।৪।

ইহারা অর্থ প্রত্যক্ষ ধর্মে প্রমাণ নহে, যেহেতু তাহা বিদ্যমান বিষয়ের প্রকাশক, ধর্ম বিদ্যমান নহে, ভবিষ্যৎ কাল-বৃত্তি। কারণ, যাগ-দানাদি ক্রিয়াই জৈমিনি মতে ধর্ম, অদৃষ্টাদিকে ধর্ম বলা যাইতে পারে না। এই যাগ-দানাদি ক্রিয়া ক্রিয়ারূপে প্রত্যক্ষ হইলেও ধর্মরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যাগদানাদি ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কল্যাণসাধন-রূপে ধর্মপদবাচ্য হইয়া থাকে। যাগ-দানাদিতে যে ভবিষ্যৎ কল্যাণসাধনরূপতা আছে তাহা শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত অন্য প্রমাণ দ্বারা জানিবার উপায় নাই। অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার সাধনতার জ্ঞানও ইন্দ্রিয় দ্বারা হইতে পারে না। এ বিষয়ে বহু বক্তব্য থাকিলেও, অপ্রাসঙ্গিক বোধে আর বিস্তৃত করা হইল না।

এ স্থলে সূত্রকার ভগবান জৈমিনির উক্তিতে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, আমাদের প্রত্যক্ষ যে ধর্মে প্রমাণ নহে, অর্থাৎ ধর্ম অস্মদাদির প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে, তাহাও সিদ্ধই আছে। আমরা যে প্রত্যক্ষ দ্বারা ধর্ম জানিতে পারি না, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং সূত্র মধ্যে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ ধর্মে অপ্রমাণ, যেহেতু প্রত্যক্ষ বিদ্যমানের গ্রাহক। যথা—

প্রত্যক্ষ ধর্মে অপ্রমাণ—প্রতিজ্ঞা

যেহেতু তাহা বিদ্যমানোপলম্ভন—হেতু

এইরূপ উক্তিতে দৃষ্টান্ত কি হইবে—জিজ্ঞাস্য হইলে, যদি বলা যায় যে, আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত ও পক্ষ এক হইয়া গেল। অতএব এই সূত্র অসঙ্গত হয়। এজন্য সূত্রের আশা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কোন বিশেষ পুরুষের প্রত্যক্ষ ধর্মে অপ্রমাণ, অর্থাৎ পক্ষ প্রত্যক্ষ পদে কোন একটি বিশেষণের নিবেশ করিতে হইবে।

এই পক্ষীকৃত প্রত্যক্ষটি কি? অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষকে ধর্মে অপ্রমাণ বলা হইতেছে, সেই প্রত্যক্ষটি কি বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা

শ্রুতিনিরপেক্ষ যোগি-প্রত্যক্ষকে ধর্মে প্রমাণ বলেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষই এ স্থলে পক্ষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিকাদি কোন তন্ত্রেই ধর্মাধর্ম শ্রুতি-নিরপেক্ষ, যোগিপ্রত্যক্ষগম্য, এরূপ স্বীকার করা হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি জৈমিনির এই বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে না, হইলে অনুক্ত উপালম্ভন দোষ হইবে। সুতরাং শ্রুতিনিরপেক্ষ যোগিপ্রত্যক্ষগম্য ধর্ম, এইরূপ স্বীকার করা হয়। এমন একটি সম্প্রদায় জৈমিনির সময়ে ছিল যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া জৈমিনি এই কথা বলিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই সম্প্রদায়ই সেই প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়।

আরও কথা এই যে, প্রত্যক্ষ ধর্মে প্রমাণ নহে, এইরূপ বলিলেই যথেষ্ট হইত। তাহাতে আবার বিদ্যমান-উপলম্ভনত্বকে হেতু করা হইয়াছে। আর এই বিদ্যমান উপলম্ভনত্ব হেতুটিকে স্থির রাখিবার জন্য অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধি-বারণের জন্য "সৎ সম্প্রয়োগে পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎপ্রত্যক্ষং," এইরূপ বলা হইয়াছে। বিদ্যমান বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। বিদ্যমান বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ জন্য যদি প্রত্যক্ষ হয়, তবে প্রত্যক্ষ বিদ্যমান বস্তুরই গ্রাহক হইবে। ভাবী ও অতীত বস্তুর সহিত বিদ্যমান ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

দেখা যায়, বৌদ্ধগণ যে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করেন, তাহাতে বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধের নামগন্ধও করেন না। বিদ্যমান বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ত দূরের কথা, তাঁহারা "কল্পনা পোঢ় অথচ অভ্রান্ত" জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলেন। ইহার অর্থ কল্পনারহিত অবাধিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। এই মতে বিকল্প প্রত্যক্ষ যথার্থ প্রত্যক্ষ নহে, যেহেতু তাহা কল্পনাযুক্ত। বৌদ্ধগণ নামকল্পনা, জাতিকল্পনা, গুণ-কল্পনা ক্রিয়াকল্পনা, দ্রব্যকল্পনা -এই -পাঁচ প্রকার কল্পনা স্বীকার করেন। সবিকল্প প্রত্যক্ষে এই পাঁচ প্রকার কল্পনার যে কোনরূপে কল্পনা থাকিবে। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে ইহারা থাকে না ; এ জন্য ইহাদের মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই যথার্থ প্রত্যক্ষ বলা হয়। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ তন্মতে ভ্রম ; নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই সলক্ষণ এবং সবিকাশক প্রত্যক্ষই সামান্য লক্ষণ, ইহাই তাঁহাদের মত।

প্রত্যক্ষের এই জৈমিনি ও বৌদ্ধ উভয়মতসিদ্ধ লক্ষণ দুটি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের বিদ্যমান সম্প্রয়োগ (সম্বন্ধ) না থাকিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না, ইহা জৈমিনির মত। আর তাহাতে অতীত ও অনাগত বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—ইহা সুতরাং সিদ্ধ হইল। আর বৌদ্ধমতের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়-সম্বন্ধের কোনই অপেক্ষা নাই। সম্বন্ধ থাকুক বা নাই থাকুক, কল্পনারহিত অভ্রান্ত জ্ঞান হইলেই প্রত্যক্ষ হইবে। সুতরাং এতাদৃশ প্রত্যক্ষ নিয়ত বিষয়-ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-সাপেক্ষ নহে। বিষয়েন্দ্রিয়

সম্বন্ধ হইয়া বা না হইয়া কল্পনারহিত অভ্রান্ত জ্ঞান উদিত হইলেই তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যাইবে। সুতরাং এতাদৃশ প্রত্যক্ষ অতীত বা অনাগত বিষয়ক হইতেও বাধা নাই। আর ইহা যদি হয়, তবে প্রত্যক্ষ দ্বারাও ভাবী ধর্ম হইতে পারিবে। আর তাহা হইলে বেদের অপেক্ষার আর কোন আবশ্যকতা নাই। এইরূপে নিরপেক্ষ বৌদ্ধ যোগীর প্রত্যক্ষগম্য ধর্মাধর্ম হইতে পারিবে। আর তাহা হইলে বেদ একান্তই নিষ্প্রয়োজন হইবে। এই উভয় মত আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, জৈমিনি বৌদ্ধমতকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত-বিরোধী এবং বেদপ্রামাণ্যের অনুকূল এই প্রত্যক্ষ সূত্রটি প্রণয়ন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, বৌদ্ধগণও বৈদিক সিদ্ধান্ত-সম্মত প্রত্যক্ষ লক্ষণ সম্মুখে রাখিয়াই তাহার বিরোধ বেদ-প্রামাণ্যের উচ্ছেদক এই প্রত্যক্ষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং জৈমিনির এই প্রত্যক্ষ সূত্রের পূর্বপক্ষরূপে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে।

প্রত্যক্ষ শব্দটির দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইন্দ্রিয়-বিষয়-সম্বন্ধ হইতে যে জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ। অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় আর বীপ্সার্থক প্রতি শব্দটি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের জ্ঞাপক। বিষয়েন্দ্রিয় নিরপেক্ষতা প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ করিলে, যোগার্থ পরিত্যাগ করিয়া রূঢ়্যর্থ গ্রহণ করা হইবে। ক্লৃপ্ত যোগার্থ পরিত্যাগ করিয়া কল্প-রূঢ়্যর্থ গ্রহণ অনুচিত। এজন্য জৈমিনি প্রত্যক্ষপদের যোগার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রত্যক্ষ সূত্রটি বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে বৌদ্ধগণও যে এদিকে লক্ষ্য করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু স্বসিদ্ধান্তের অনুরোধে তাঁহারা যোগার্থ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভগবান বুদ্ধের অবিকল্প অভ্রান্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ, ইহা রক্ষা করিবার জন্য, ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্বন্ধ জন্য প্রত্যক্ষ বলিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহারা কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ শব্দটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে অপরোক্ষ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা পরোক্ষ নহে, তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরোক্ষ-জ্ঞান-নিরূপণাধীন নিরূপণ করিয়াছেন, স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষকে নিরূপণ করেন নাই। জৈমিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণ কিন্তু স্বরূপত নিরূপণই করিয়াছেন।

যাহা হউক, ভগবান জৈমিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকেই নাম নির্দেশ করিয়া ধর্মে অপ্রমাণ বলিয়াছেন। অনুমানাদিকে এরূপ ভাবে ধর্মে অপ্রমাণ বলেন নাই। অনুমানাদিও ধর্মে প্রমাণ নহে, ইহাও জৈমিনির সিদ্ধান্ত; তথাপি ধর্মে অনুমান প্রমাণগ্রাহ্য, এরূপ সাক্ষাৎ কোন কথা বলেন নাই। এইরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।" জৈমিনি ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন, তন্মধ্যে শব্দপ্রমাণ ব্যতিরিক্ত আর পাঁচটি প্রমাণই ধর্মাধর্মে প্রমাণ হইতে পারে না— ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। অথচ কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণটি ধর্মাধর্মে সাক্ষাৎভাবে

অপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এইরূপই অবগত হওয়া যায় যে ধর্মাধর্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ এরূপ কোন সম্প্রদায় তাঁহার সময়ে প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল, তাই তিনি প্রত্যক্ষের নাম লইয়া প্রত্যক্ষকে ধর্মাধর্মের অপ্রমাণ বলিয়াছেন। আর ধর্মাধর্ম শব্দ ভিন্ন নিরপেক্ষ অনুমানাদি প্রমাণগম্য এরূপ কোন প্রতিপক্ষ না থাকায়, তাহা সাক্ষাৎ তিনি উল্লেখ করেন নাই।

এইরূপ জৈমিনির ৫ম সূত্রে অর্থাৎ 'ঔৎপত্তিক" সূত্রে যে শব্দের প্রামাণ্য নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাতেও বৌদ্ধমতকেও পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সূত্রে "অর্থেঽনুপলব্ধঃ বাদারয়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" এই অংশে বেদবাক্যের অগৃহীত-গ্রাহিত্ব এবং অবাধিত-বিষয়কত্ব বলা হইয়াছে। বেদবাক্য গৃহীতগ্রাহীও নহে, প্রমাণান্তর-বাধিত বিষয়েরও প্রতিপাদক নহে—এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধগণ বাক্যমাত্রকে গৃহীতগ্রাহী বলিয়া থাকেন। আর তাহা অবাধিতার্থক হইতেও পারে না—এইরূপ বহু যুক্তি দ্বারা ইহা তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন। এই বৌদ্ধমতের প্রতিরোধের জন্যও জৈমিনির ঔৎপত্তিক সূত্রটি প্রণীত হইয়াছে। মীমাংসা-দর্শনের প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদে বৌদ্ধমত খণ্ডনে মহর্ষি জৈমিনির ইহাই ইঙ্গিত।

তদ্রূপ প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদে প্রথমেই ৩য়।৪র্থ সূত্রে মহর্ষি জৈমিনি বলিতেছেন—"বিরোধেত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতিহ্যনুমানম্। ১।৩।৩

"হেতুদর্শনাচ্চ" ১।৩।৪

ইহাতেও মহর্ষি জৈমিনি বৌদ্ধমতকেই পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধাদিমত ধর্মে অপ্রমাণ, ইহাই দেখাইবার জন্য প্রথম সূত্রটি রচিত। আর দ্বিতীয় সূত্রটি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই সহায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধাদি মতে ধর্মোপদেশমাত্রই হেতুজাল-সমাক্রান্ত। তাঁহারা কখনও হেতু-প্রদর্শন ব্যতিরেকে ধর্ম উপদেশ করেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা ধর্মাধর্ম বেদপ্রামাণক বলিয়া স্বীকার করেন না। এজন্য তাঁহাদের উপদেশে হেতুপ্রদর্শন আবশ্যক হয়। আর্যশাস্ত্রকারগণ ধর্মাধর্মে হেতুপ্রদর্শন করেন না। প্রত্যুত যাহা হেতুমূলক, তাহা কখনও ধর্ম হইতে পারে না ইহাই বলেন। আর এই কথাই এস্থলে "হেতুদর্শনাচ্চ" সূত্রে জৈমিনি বলিলেন। বৌদ্ধাদির ধর্মপ্রতিপাদক আগম যে কেবল বেদবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রমাণ তাহা নহে, কিন্তু হেতুদর্শনযুক্ত বলিয়াও অপ্রামাণিক।

আর এই কথারই সার সঙ্কলন ভগবান্ মনুর উক্তিতেও পাওয়া যায়—

"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ঃ যাশ্চ কাশ্চকুদৃষ্টয়ঃ।
সর্বাস্তানিষ্ফলা প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্মৃতাঃ॥
যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভি র্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

এস্থলে যে হেতুশাস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, ইহাই 'হেতুদর্শনাচ্চ' সূত্রের তাৎপর্য্য। আরও—

পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতীকান্ শঠান্।
হেতুকান্ বকবৃত্তিংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ।

কুমারিল ভট্টও এই সূত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

বৌদ্ধাদয়স্তু সর্বত্র কুর্বাণা ধর্মদেশনাম্।
হেতুজালবিনির্মুক্তান্ ন কদাচন কুর্বতে॥

উদয়নাচার্য্যও কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে মহাজন-পরিগ্রহ নিরূপণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"হেতুদর্শনাদর্শনাভ্যাং বিশেষাৎ"—ইত্যাদি।

তাহার পর বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধাদি মতের অপ্রামাণ্য নিরূপণ করিতে যাইয়া জৈমিনি বলিতেছেন—

শিষ্টাকোপে অবিরুদ্ধমিতি চেৎ ১।৩।৫
ন শাস্ত্রপরিমাণত্বাৎ ১।৩।৬

ইহাদের অর্থ- শিষ্ট অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত কর্মরাশির অকোপে অর্থাৎ অবাধে অথবা শিষ্ট বেদবাদিগণের যাহা কোপকারণ নহে, যেমন বিহার, আরাম, মণ্ডল-করণ প্রভৃতি এবং বৈরাগ্য, ধ্যানাভ্যাস, অহিংসা, সত্যবচন, দম, দান, দয়া প্রভৃতি যাহা বেদবিরুদ্ধ অথচ বুদ্ধভাষিত, তাহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ হইতে পারিবে—যদি বলা হয়, তাহা হইলে তদুত্তরে বলা হইতেছে "ন শাস্ত্রপরিমাণত্বাৎ" অর্থাৎ না, তাহা হইতে পারে না! কারণ, পরিমিত অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বা অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান যাহা শিষ্টগণ পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ইত্যাদি গ্রন্থ বিহিত হয় নাই। এজন্য তাহা প্রমাণ নহে। এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, উদাহৃত সূত্র দুইটির মধ্যেও মহর্ষি জৈমিনি বৌদ্ধমতকে লক্ষ্য করিয়া সূত্র রচনা করিয়াছেন। আর তাহা হইলে গৌতমবুদ্ধের পূর্বেও বৌদ্ধমত ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তাহার পর "প্রয়োগশাস্ত্রমিতি যেন্নাসনিয়মাৎ" ১।৩।১১-১২

এই সূত্রে মহর্ষি জৈমিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতেও তিনি বৌদ্ধমতকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বলা যায়। কারণ বৌদ্ধশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্গত হইতে পারে না, ইহা ১।৩।৪ সূত্রে বলা হইলেও, বেদশাখাস্বরূপ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা-নিবারণের জন্য বলা হইতেছে—না, তাহা হইতে পারে না ইত্যাদি। এস্থলে আশঙ্কা এই যে, বৌদ্ধগণ তাহাদের আগমগুলিকে বেদের ন্যায় নিত্যই বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের আগম-প্রতিপাদিত ধর্মও "চোদনা-লক্ষণ" হইতে পারিবে। যেহেতু তাঁহারা বলেন, বুদ্ধবাক্য মন্বাদি বাক্যের ন্যায় বুদ্ধ-প্রণীত নহে, কিন্তু বেদ-শাখার ন্যায় প্রবচন জন্য নাম-নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

যমন কাঠক, কালাপক প্রভৃতি বেদশাখা কঠ, কলাপ প্রভৃতি ঋষিগণের নামে আখ্যাত হইলেও, তাহা যেমন সেই ঋষিকৃত নহে, কিন্তু তাঁহারা সেই সেই শাখার প্রবর্তক মাত্র। এইরূপ বুদ্ধাগমও বুদ্ধপ্রণীত নহে ; কিন্তু বুদ্ধ তাহাদের প্রবর্তক মাত্র। এইরূপ আশংকার উত্তর "নাসন্নিয়মাৎ" অংশদ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ বৌদ্ধাদ্যাগম সন্নিবন্ধন নহে, কিন্তু অসন্নিবন্ধন। অর্থাৎ বৌদ্ধাদ্যাগম স্বরবর্জিত এবং অসাধু-শব্দবহুল। এজন্য তাহা প্রয়োগ-শাস্ত্র হইতে পারে না। (এতদ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মহর্ষি জৈমিনির সময়ে বৌদ্ধগণ তাঁহাদের শাস্ত্রকে বেদের ন্যায় নিত্য বলিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন।) সুতরাং বৌদ্ধাগম বেদ বা বেদের ন্যায় অনাদি শাস্ত্র হইতে পারে না। অথবা এরূপও অর্থ হয় যে, যাঁহারা ক্ষণভঙ্গুর শূন্যবাদ, নিরাত্মবাদ প্রভৃতি অসৎ হেতু দ্বারাই প্রতিপাদিত করিয়াছেন, তাঁহারাই অবের ধর্ম প্রতিপাদনও করিয়াছেন। সুতরাং তাদৃশ কর্তৃক ধর্মবচন অপ্রমাণ।

তাহার পর অপভ্রংশভাষা অনাদিত্বখণ্ডনাভিপ্রায়ে মহর্ষি জৈমিনি বলিতেছেন—

"অন্যায়শ্চানেকশব্দত্বম্ ১।৩।২৬"

তত্র তত্ত্বমভিযোগবিশেষাৎ স্যাৎ ।১।৩।২৭

এই সূত্রদ্বয়দ্বারা অপভ্রংশ শব্দসমূহের সাদিত্ব কথিত হইয়াছে। এই অপভ্রংশ শব্দ অপৌরুষেয় হইতে পারে না। যে সমস্ত আগম, অপভ্রষ্টশব্দ-বহুল তাহাদের অনাদিত্ব থাকিতে পারে না। সাধুশব্দই অনাদি অপৌরুষেয়। এই সাধুশব্দাত্মক বেদরাশি অপৌরুষেয় ও অনাদি। এতদ্ব্যতীত অপর সমস্তই পুরুষকল্পিত ও সাদি। ভগবান্ জৈমিনির এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, অপভ্রংশবহুল বৌদ্ধাদির আগম পুরুষকল্পিত এবং পুরুষদোষদুষ্ট। মহর্ষি জৈমিনি ইহাই লক্ষ্য করিয়া এই সূত্রদ্বয় রচনা করিয়াছেন। যেহেতু বৌদ্ধগণ এই অপভ্রষ্ট শব্দকেই অপৌরুষেয় বলিবার প্রয়াস করিয়াছেন। ইহার নিদর্শন বৌদ্ধসূত্রে দেখা যায়, ইহা চন্দ্রকীর্ত্তি মাধ্যমিককারিকার টীকায় বলিয়াছেন (পৃঃ ৩৬৬ রাষিয়া সং) যথা—

"যথা যন্ত্রকৃতং তূর্যাং বাদ্যতে পবনেরিতম্।
নচাত্র বাদকঃ কশ্চিন্নিশ্চরন্ত্যথচ স্বরাঃ ॥
এবং পূর্বসুশুদ্ধাত্বাৎ সর্বসত্ত্বাশয়েরিতা।
বাঙ্ নিশ্চরতি বুদ্ধস্য নচাস্যাস্তীহ কল্পনা ॥

বস্তুতঃ বুদ্ধবাক্য কি প্রাচীন কি অর্বাচীন—সকলই নিকৃষ্ট অপভ্রংশরূপ বলিয়া জানা যায়। এজন্য মহর্ষি জৈমিনি যে সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য বৌদ্ধাদি মতই বলা হইয়াছে। ২৩৭ পৃষ্ঠা তন্ত্রবার্তিক আনন্দ আশ্রম সংস্করণ মধ্যে এই অপভ্রংশ ভাষার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে।

উপবর্ষবৃত্তির দ্বারা প্রমাণ

তাহার পর জৈমিনি সূত্রের উপর যে উপবর্ষবৃত্তি আছে, তাহার রচয়িতা ভগবান্ উপবর্ষ বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী। এই উপবর্ষের বৃত্তিগ্রন্থ সম্পূর্ণ আমরা না পাইলেও আচার্য্য শবরস্বামী ইহার ত্রিসূত্রী ব্যাখ্যার যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, যে ভগবান্ উপবর্ষ বৌদ্ধমতের খণ্ডনাভিপ্রায়ে প্রত্যক্ষ-সূত্র এবং ঔৎপত্তিক-সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মীমাংসা-দর্শনে তর্কপাদে যে গহনবিচারাংশ ভাষ্যমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই ভগবান্ উপবর্ষের কথা। অনেকে এই উপবর্ষের কথাই ভাষ্যকার শবরস্বামী অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা না বুঝিয়া ইহা ভাষ্যকারেরই মত বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভাষ্যকার ত্রিসূত্রীয় ব্যাখ্যাতে প্রথমতঃ নিজ মত অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া পরে "বৃত্তিকারস্তু অন্যথা ইমং গ্রন্থং বর্ণয়াঞ্চকার তস্য নিমিত্ত-পরীষ্টিরিত্যেবমাদিং" বলিয়া বৃত্তিকারের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন।

এই অনুবাদটি বৃত্তিকারের সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও, তাহা যে প্রায়শঃ তাঁহারই ভাষা ও তাঁহারই মত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই উপবর্ষাচার্য্য প্রত্যক্ষলক্ষণ প্রসঙ্গে "ননু সর্ব এব নিরালম্বনঃ স্বপ্নবৎ প্রত্যয়ঃ, প্রত্যয়স্য নিরালম্বনতা স্বভাবঃ উপলক্ষিতঃ স্বপ্নে' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের অনুবাদ করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। আর এই প্রসঙ্গেই "অর্থজ্ঞানয়োঃ আকারভেদং নোপালভামহে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিজ্ঞানবাদের স্বরূপ অতি সুস্পষ্ট করিয়াছেন এবং তাহার খণ্ডনও করিয়াছেন।

এইরূপ ভগবান্ উপবর্ষ লোকপ্রসিদ্ধ অনুমানলক্ষণ দেখাইয়া সেই অনুমান দুই প্রকার—এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—"তৎ তু দ্বিবিধম্ প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট-সম্বন্ধং সামান্যতো দৃষ্টসম্বন্ধং চ।" এই সামান্যতো দৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান বৌদ্ধ-দিগের অভিমত নহে। কেবলমাত্র তাহাদেরই খণ্ডনাভিপ্রায়ে এই অনুমানদ্বৈবিধ্য বৃত্তিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমেয়দ্বৈবিধ্যপ্রতিপাদন নিষ্প্রয়োজন। অনুমানের লক্ষণ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়া প্রমেয়দ্বৈবিধ্য প্রদর্শন সম্মত হইতে পারে না। কেবল বৌদ্ধমত প্রত্যাখানের জন্যই অনুমান প্রমাণের প্রমেয় দ্বিবিধ দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধগণ সামান্যতো দৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান স্বীকার করেন না। সামান্যতো দৃষ্টসম্বন্ধ অনুমানের উদাহরণস্বরূপে ভগবান্ বৃত্তিকার উপবর্ষ বলিয়াছেন,—দেবদত্তাদির গতিপূর্বক দেশান্তরপ্রাপ্তি দেখিয়া আদিত্যের গতি অনুমান করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—এই দৃষ্টান্তদ্বারা আদিত্যের গতি অনুমিত হয় না। কারণ, এতদ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না। বৌদ্ধমতে ক্রিয়াবান্ হইতে ক্রিয়া ভিন্ন নহে, এজন্য তাঁহাদের মতে এই অনুমানের আবশ্যকতাও নাই। যেহেতু

তাঁহাদের মতে সবই ক্ষণিক। দ্রব্যই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া দ্রব্যভিন্ন দ্রব্যাশ্রিত ক্রিয়া আর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা হয় না। দ্রব্যকে স্থির বলিয়া স্বীকার করিলেই দ্রব্যভিন্ন ক্রিয়া অতিরিক্ত স্বীকার করিতে হয়। বৃত্তিকার উপবর্ষ প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারা দ্রব্যের স্থায়িত্ব সিদ্ধ করিয়া দ্রব্যের ক্রিয়া অনুমিত হয়—এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব বৃত্তিকার উপবর্ষের পূর্বেও বৌদ্ধমত ছিল বুঝা গেল।

বৃত্তিকার উপবর্ষ বলিয়াছেন "যস্য চ দুষ্টং করণং যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ স এব অসমীচীনপ্রত্যয়ঃ নান্যঃ" অর্থাৎ যে প্রতীতিতে বেধকজ্ঞান ও করণদোষের জ্ঞান থাকে, তাহাই মিথ্যা প্রতীতি বা অসমীচীন প্রতীতি। তদ্ভিন্ন প্রতীতি মিথ্যা বা অসমীচীন নহে। এইরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, বৌদ্ধসম্মত বিকল্প প্রত্যক্ষ, তাহাতে বেধকজ্ঞান ও করণদোষের জ্ঞান না থাকিলেও বিকল্প প্রত্যক্ষকে অসমীচীন প্রত্যয় বলিয়া বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই মতের খণ্ডনাভিপ্রায়ে বৃত্তিকার পূর্বোক্ত কথা বলিয়াছেন। অতএব দেখা গেল—বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষের পূর্বেও বৌদ্ধমত ছিল।

ইহার পর বৃত্তিকার বলিয়াছেন "সর্ব এব নিরালম্বনঃ স্বপ্নবৎ প্রত্যয়ঃ, প্রত্যয়স্য হি নিরালম্বনতাস্বভাবঃ উপলক্ষিতঃ স্বপ্নজাগ্রতোঽপি স্তম্ভ ইপি বা কুড্য ইতি বা প্রত্যয় এব ভবতি। তস্মাৎ সোঽপি নিরালম্বনঃ।" অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানই নিরালম্বন জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয় নাই, যেমন স্বাপ্ন প্রত্যয়। স্বপ্নে স্তম্ভ-কুড্যাদি বিষয়ক জ্ঞান হয়, কিন্তু স্তম্ভকুড্যাদি বিষয় থাকে না। এইরূপ জাগ্রতকালেও জ্ঞানই হইয়া থাকে, তাহার অধিক কিছু থাকে না। সুতরাং স্বপ্ন-জ্ঞানের মত জাগ্রত জ্ঞানও নিরানলম্বনই হইবে। নিরালম্বনতাই জ্ঞানের স্বভাব। এই স্বভাব আমরা স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারি। এইরূপে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত প্রদর্শন করিয়া তাহার খণ্ডন বৃত্তিকার করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারাও উপবর্ষের পূর্বে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত ছিল ইহা স্থির হয়।

আবার দেখা যায়, বৃত্তিকার বলিতেছেন—"শূন্যস্তু কথম্? অর্থজ্ঞানয়োরাকারভেদং ন উপলভামহে প্রত্যক্ষা চ নো বুদ্ধিঃ, অতঃ তদ্ভিন্নম্ অর্থরূপং নাম ন কিঞ্চিদস্তি ইতি পশ্যামঃ"। অর্থাৎ বৃত্তিকার বাহ্যার্থশূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ করিয়া পুনর্বার 'শূন্যস্তু কথম্' বলিয়া আবার সেই বাহ্যার্থশূন্যবাদের অবতারণা করিতেছেন। বৃত্তিগ্রন্থমধ্যে যে 'শূন্যস্তু' কথাটি আছে, ইহা মাধ্যমিক বৌদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু বাহ্যার্থশূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এরূপ না বলিলে, পরবর্তী গ্রন্থ সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। পূর্বে জ্ঞানকে নিরালম্বনস্বভাব বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও বিজ্ঞানবাদিগণ নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন।

যথা—বিজ্ঞান স্বাতিরিক্ত বিষয়ান্তরকে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানভিন্ন বিষয়ের কোন সম্বন্ধই নাই। অসম্বন্ধ বিষয়ের প্রকাশ, বিজ্ঞান করিলে সমস্ত জীবেরই সর্বজ্ঞতাপত্তি হইবে।

আরও কথা এই যে, অর্থ ও জ্ঞানের আকারভেদ অনুভবসিদ্ধ নহে। আমাদের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই আকার ঘটপটাদি হয়। জ্ঞান ও বিষয় উভয়ই প্রত্যক্ষ—এরূপ কল্পনার কোন মূল নাই। যদি উভয়ের আকার ভেদপ্রত্যক্ষ হইত, তবে এরূপ বলা যাইতে পারিত। একটিই মাত্র আকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেই আকারটি জ্ঞানেরই আকার, তদ্ব্যতিরিক্ত আর অন্য কোন আকার অবশিষ্ট নাই, যাহা বিষয়ের আকার বলা যাইতে পারে। এজন্য শব্দাদি বিষয় জ্ঞানেরই আকার, বাহ্য আর কোন বস্তু নাই। বৌদ্ধমতে জ্ঞান প্রত্যক্ষ—ইহা বলা হইয়াছে। নীলাদি বিষয়ের আকারও প্রত্যক্ষ। সুতরাং নীলাদি যে বিজ্ঞানের আকার—ইহাই বুঝা যায়। এজন্য সূত্রকার জৈমিনি যে "তৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম" বলিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধমতে সর্বথা অসঙ্গত হয়। আর ইহারই খণ্ডনের জন্য বৃত্তিকার বলিতেছেন—"স্যাৎ এতদেবং যদি অর্থাকারা বুদ্ধিঃ স্যাৎ, নিরাকারা তু নো বুদ্ধিঃ আকারবান্ বাহ্যোঽর্থঃ।" অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বিষয়াকারিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া বাহ্য বিষয়ের অপলাপ করিয়া থাকেন, এতদুত্তরে বৃত্তিকার বলিলেন যে, জ্ঞান বিষয়াকার নহে। জ্ঞান নিরাকার। আকারবান্ বাহ্য বিষয়। যাহা আকারবান্ তাহা বহির্দেশে প্রতীক হয়। জ্ঞান নিরাকার ও আন্তর, বহির্দেশস্থ নহে। সুতরাং জ্ঞান ও বিষয় অভিন্ন হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানভিন্ন বাহ্য বস্তুই হয়। কিন্তু জ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। বিষয় জ্ঞাত হইলে, তদ্দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হয়। আবার বলিতেছেন—"নহি অজ্ঞাতে অর্থে কশ্চিৎ বুদ্ধিম্ উপলভতে জ্ঞাতে তু অনুমানাৎ অবগচ্ছতি, তত্র যৌগপদ্যম্ অনুপপন্নম্। তথাৎ অপ্রত্যক্ষা বুদ্ধিঃ।" অর্থাৎ বিষয় জ্ঞাত না হইলে, আমরা জ্ঞান জানিতে পারি না। বিষয় জানা ও জ্ঞান জানা এককালে হয় না। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ জ্ঞান ও বিষয়ের নিয়ত যুগপৎ উপলম্ভ হয় বলিয়া বিষয়ের অপলাপ করিয়া থাকেন। বৃত্তিকার বলিতেছেন—জ্ঞানের প্রত্যক্ষত উপলম্ভ হয়ই না, এবং যাহাও অনুমান হয়, তাহাও বিষয়োপলব্ধির সহিত এককালে হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানবাদীর কথা অসঙ্গত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৃত্তিকার প্রত্যেক বাক্যদ্বারা বৌদ্ধমতই খণ্ডন করিতেছেন। বৃত্তিকারকর্তৃক নিরাকৃত বৌদ্ধমত বিজ্ঞানবাদ।

বৃত্তিকার উপসংহারে বলিয়াছেন—"তস্মাৎ অর্থালম্বনঃ প্রত্যয়ঃ। ন নিরালম্বনঃ প্রত্যয়ঃ।" অর্থাৎ জ্ঞান সবিষয়ক, কিন্তু নির্বিষয়ক নহে। আর এই জন্য জৈমিনির প্রত্যক্ষলক্ষণ নির্দোষ। কারণ, জৈমিনি যে বলিয়াছেন—যে বিষয়ক

প্রত্যক্ষ হয়, সেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের বিদ্যমান সম্প্রয়োগ জন্য যে জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ এবং তাহা যথার্থ। এই প্রত্যক্ষলক্ষণ ব্যভিচারী হইতে পারে না। অবশ্য শবরস্বামী এই অর্থ স্বীকার করেন নাই। তিনি জৈমিনির সূত্রটিকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি মাত্র ইহাই বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ধর্মের প্রমাণ হইতে পারে না। যে জন্য পারে না তাহাই মাত্র এস্থলে জৈমিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষের পূর্ণ লক্ষণ প্রদর্শন করা জৈমিনির অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের মতেই জৈমিনি যে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার জন্য এই সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা ইহাদের কথা হইতে জানা গেল অতএব বৌদ্ধমত, উপবর্ষ এবং জৈমিনির পূর্বেও ছিল। প্রদর্শিত স্থল ব্যতীত জৈমিনিসূত্রে বহুস্থলই আছে, যাহা বৌদ্ধমতনিবারণের জন্য বলা হইয়াছে। তবে বর্তমান গৌতমবৌদ্ধমত ও উক্ত প্রাচীন বৌদ্ধমত যে সর্বত্র অভিন্ন, তাহা নহে। কোন কোন স্থলে মতভেদ দেখা যায়। ইহা হইতে মনে হয়—গৌতম বুদ্ধ, ঋষিদিগের দ্বারা প্রাচীন বৌদ্ধমত খণ্ডিত দেখিয়া তিনি কোন অংশে পরিবর্তন করিয়া বৌদ্ধমত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আর এইজন্য পরবর্তী ভাষ্যকারগণ উভয় মত এক করিয়া অনেক স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন। আর তজ্জন্য বাচস্পতি প্রভৃতি আচার্যগণ স্থলে স্থলে বৌদ্ধমত পরিষ্কার করিবার জন্য পরবর্তী দিঙ্নাগ ও ধর্মকীর্তি প্রভৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাহার পর এই মীমাংসাদর্শন বা জৈমিনির দর্শন হইতেই তাহার বিকৃতি জৈনদর্শনের উৎপত্তি। সমস্ত দার্শনিকগণ তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলিয়াছেন। যে সমস্ত দার্শনিকগণ তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলেন না, তাঁহারা দার্শনিক পদবাচ্যই হইতে পারেন না। কারণ, নিরপেক্ষ শব্দানুশাসনের বিরুদ্ধ শব্দ কল্পনা করিলে তাহা যেমন অপভ্রষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়, তদ্রূপ নিরপেক্ষ ন্যায়দর্শন-বিরুদ্ধ মত কল্পনা করিতে গেলেও তদ্রূপ অন্যায় বা অদার্শনিকতা হয়। "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" ইহা সর্বতন্ত্রাবিরুদ্ধ। যে কোন দার্শনিক হউন না কেন, ইহার সহিত তাহাদের বিরোধ হইতে পারে না। এজন্য পাণিনির শব্দানুসান যেমন কোন মতের গ্রন্থ নহে, তদ্রূপ গৌতম-দর্শনও কোন মতের গ্রন্থ নহে। শাস্ত্রতাৎপর্যে অপ্রবিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন কেহই গৌতমানুশাসনখণ্ডনের জন্য প্রয়াস করেন নাই; দেখা যায়—কর্মকাণ্ডনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া মীমাংসক কর্মের স্তুতি-অভিপ্রায়ে কর্ম হইতেই মুক্তি হয়—এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। কেবলমাত্র নাস্তিক্য নিরাকরণাভিপ্রায়েই মীমাংসকগণ এইরূপ বলিয়াছেন। কর্মদ্বারাই মোক্ষ হয়—ইহা তাঁহাদের প্রকৃত তাৎপর্য-বিষয়ীভূত নহে। কুমারিলভট্ট স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন—

"ইত্যাহ নাস্তিক্য- নিরাকরিষ্ণুরাত্মাস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা।
দৃঢ়ত্বমেতদ্বিষয়স্তু বোধঃ প্রয়াতি বেদান্তনিষেবণেন।"

সূত্রকার কোন স্থলেই মোক্ষের আলোচনা করেন নাই। যেহেতু কর্ম-মীমাংসাতে মোক্ষনিরূপণ অপ্রাসঙ্গিক। মীমাংসাদর্শনে কর্মের মোক্ষোপযোগিতা শ্রবণ করিয়াই জৈনগণ কর্মদ্বারাই মোক্ষ প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে কোন স্থলেই কর্মাণ্টকনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ জ্ঞানসাধ্য বলা হয় নাই। এইরূপে মীমাংসার অনুসরণ করিয়া জৈনগণ নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্তী সময়ে সম্যক্‌জ্ঞান সম্যক্‌দর্শনাদির আলোচনা তাঁহাদের দ্বারা যাহা করা হইয়াছে, তাহাও তত্ত্বজ্ঞান নহে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানাপনোদনীয় মিথ্যাজ্ঞানকে সংসারের কারণ, তাঁহারা বলেন নাই। সুতরাং ইঁহাদের মতে জ্ঞানে মুক্তি সম্ভবপর হইল না। কর্মাপেক্ষিত জ্ঞানের নিরূপণ থাকিলেও, মোক্ষসাধন নিরপেক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের নিরূপণ নাই। এইরূপ বহু দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবসম্প্রদায় তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা স্বীকার করেন না, কিন্তু মানস কর্মকে মুক্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করেন। এই মানস কর্ম কিন্তু জ্ঞান নহে।

আর এই জৈন মতের প্রবর্তক অর্হত। ইনি বিষ্ণুপুরাণানুসারে ভগবানের শরীর হইতে উৎপন্ন মায়ামোহের অবতার বলা হইয়াছে। অতএব এই অর্হত-মতও বর্তমান জৈনমতের পূর্ববর্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে। বুদ্ধদেব ও মহাবীর স্বামী উভয়েই সেই প্রাচীন বৌদ্ধ ও অর্হতমতের সংস্কার সাধন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। উভয় মতেই এই বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্বে বহু বুদ্ধ ও আর্হতমত স্বীকার করা হইয়া থাকে।

[প্রবর্তক শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৪২]

হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আজকাল কুশিক্ষার প্রভাবে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত বিরোধিতা করিয়া এই ধর্মমত প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ঘোর বিরুদ্ধবাদী। এই মতটা নানা দিক হইতে নানা আকারে শুনিয়া শুনিয়া লোকের মন এতটা বিগড়াইয়া গিয়াছে যে তাহারা আর উহার বিপরীত কথা শুনিতে চাহে না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এ ধারণা যে ভুল, তাহা বেশ বুঝা যায়। প্রথমতঃ বুদ্ধদেব হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা বিষ্ণুর অবতার। হিন্দুরা বুদ্ধদেবের স্তব করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্-ভাগবতকার লিখিয়াছেন—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্,
বুদ্ধনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।"

তাহার পর কলির সঞ্চার হইলে অসুরদিগের মোহ উৎপাদনের জন্য বিষ্ণু অঞ্জননন্দন (মতান্তরে অজিননন্দন) বুদ্ধ নাম ধারণ পূর্বক কীকটে অর্থাৎ মধ্যগয়ায় আবির্ভূত হইবেন। মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে।—

"কর্ত্তুং ধর্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্।
বুদ্ধো নবমকে জজ্ঞে তপসা পুষ্করেক্ষণঃ।"

তপস্যার দ্বারা ধর্মের ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং অসুরদিগের নিধন করিবার জন্য পদ্মলোচন হরি নবম অবতারে বুদ্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। ভগবানের ভক্ত জয়দেব গোস্বামী দশাবতার-স্তোত্রে বলিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্, সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে।"

হে ধৃত-বুদ্ধশরীর কেশব! আহা! তোমার সদয় হৃদয় পশুবলি দর্শনে ব্যথিত হইয়াছিল বলিয়া তুমি একদিন যজ্ঞবিধিসম্বন্ধীয় শ্রুতি-(বেদ) গুলিকে নিন্দা করিয়াছিলে। হে জগদীশ! হে হরে! তোমার জয় হউক। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এবং ভক্তের স্তুতিতে বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার বলা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মচক্র শ্রীহরি কর্তৃক প্রবর্তিত বলা যাইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য, শ্রীহরি কি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই ধর্মচক্র প্রবর্তিত করিয়াছিলেন? ভাগবতকার বলিতেছেন, সুরদ্বেষী অসুরদের মোহ উৎপাদনের জন্য। অন্য পুরাণকার বলিতেছেন যে ধর্মের

ব্যবস্থাপন এবং অসুরদিগের উচ্ছেদসাধনের জন্য। অসুর কাহারা? অস্যতি দেবান্ ক্ষিপতি দূরী-করোতি ইতি অসুরঃ। অর্থাৎ যাহারা হিন্দুর দেবদেবী মানে না, তাহারাই অসুর। অসুরেরা যে অনার্য্য, তাহা মনে হয় না। পুরাণ-কারগণ বলেন যে, অসুরগণ কশ্যপ ঋষির ঔরসে দিতির গর্ভে জন্মে। দিতি দক্ষপ্রজাপতির দুহিতা। সুতরাং অসুরগণের পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয় আর্য্যবংশীয়। তাহারা অনার্য্য হইবে কেন? হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ উভয়েই মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে জাত। তাঁহারা হরিবিদ্বেষী বা বৈদিক দেবতায় অবিশ্বাসী বলিয়া 'অসুর' এই অভিখ্যা পাইয়াছিলেন। আবার কংস অসুর ছিলেন। এই কংস ক্ষত্রিয় উগ্রসেনের পুত্র এবং রাজা আহুকের পৌত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের মাতুল ছিলেন। তবে ইনি বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়াই অসুর নামে কথিত হইয়াছিলেন। অতএব পুরাণ হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, আর্য্যবংশীয়দিগের মধ্যে যাহারা বৈদিক-ধর্মদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারাই অসুর নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদিগের মোহের জন্যই বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, ইহা গরুড়পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি বহু পুরাণ হইতে দেখা যাইতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য, শাক্যসিংহকে হিন্দুরা প্রথমেই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, না, বৌদ্ধধর্মপ্লাবনের বেগ দেখিয়া ভীত হইয়া পরে তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন? যদি হিন্দুরা সন্ত্রস্ত হইয়া বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে 'সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্' এ কথা লিখিতেন না। অথচ এই কথাটা ভাগবতে এবং গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে। ইহাতে অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে যে, হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহার প্রবর্তিত কর্মকান্ডবর্জিত ধর্মকে স্বীকার করিয়া লয়েন নাই। তাঁহারা যে বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ভাগবতে অক্রূরকৃত বিষ্ণুস্তবে বলা হইয়াছে—"নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।" আপনি দৈত্যদানবদিগের মোহনকারী বিশুদ্ধাত্মা বুদ্ধদেব। অর্থাৎ তিনি স্বীয় প্রবর্তিত ধর্ম দ্বারা দৈত্যদানব বা অসুরদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহাদিগকে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ম হইতে লোককে পাষন্ডধর্মে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। (ভাগবত ১০।৪০ অ ২২ শ্লোক) অথচ তাঁহাকে শুদ্ধ বা পবিত্র বলা হইয়াছে। কারণ, তিনি জ্ঞানকাণ্ডের প্রবর্তক। তিনি হিন্দুধর্ম হইতে আপনাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।

প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অনেক পরে হিন্দুরা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এ কথা

কতদূর সত্য, তাহা বলা কঠিন। প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের এ সম্বন্ধে অনেক কথাই আন্দাজী বা অনুমানমূলক। হিন্দুর কোন গ্রন্থেই আমি উহার সমর্থক কোন কথাই পাই নাই। তবে বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ প্রভৃতি পড়িলে মনে হয় যে, বুদ্ধদেবের জীবিত অবস্থায় কোন বিশিষ্ট হিন্দুই তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানিয়া লয়েন নাই। কারণ, অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ককালে সাধারণ প্রতিপক্ষ হিসাবেই তর্ক করিয়াছিলেন। কোন বিশিষ্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার প্রথম ভ্রমণকালে সাক্ষাৎ বা আলোচনা হয় নাই। সেই জন্য এ উর্স্‌লী (Worsloy) বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব যদি তাঁহার প্রথম ভ্রমণকালে দুই জন বৈদিক শাস্ত্রে বিশিষ্ট-জ্ঞান-সম্পন্ন অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পাইতেন, তাহা হইলে প্রাচীন জগতে সমস্ত ইতিহাস পরিবর্তিত হইয়া যাইত। * একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশের কোন হিন্দুই এ কথা বুঝিলেও বলিতে সাহসী হয় নাই। আমার ধারণা, বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরই তিনি হিন্দুর নিকট অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা আমার বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ কি, তাহারই আলোচনা আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বুদ্ধদেব কবে হিন্দুর দেবতা হইলেন, তাহা আমার আলোচ্য বিষয় নহে।

এখানে আর একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। না বলিলে পাঠকদিগের মনে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম যদি হিন্দুধর্মের অঙ্গই হইবে, তাহা হইলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে, অশোকেরও পরে, হিন্দুদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদ ঘটিয়াছিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। শাক্ত ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম একই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইলেও তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল কেন? অনেক বৈষ্ণব এখনও কালীমন্দিরের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইলে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান, বিল্বপত্রকে তেফড়কা পাতা বলেন। এইরূপ সৌর, গাণপত্য, শৈব প্রভৃতির বিবাদ এই ভারতে নিতান্ত অল্প হয় নাই। অথচ ঐ সকল ধর্ম এক হিন্দুধর্মেরই অঙ্গীভূত। রোমান ক্যাথলিক চার্চ, প্রোটেস্টান্ট, প্রিসবিটেরিয়ান, ব্যাপটিস্ট, মেথডিস্ট প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ও খৃষ্টধর্মের অঙ্গ হইতে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি বিবাদ বাধে নাই? না মারামারি কাটাকাটির কিছু অভাব ঘটিয়াছে? ইসলাম ধর্মের অঙ্গ হইতে সিয়া এবং সুন্নি দুইটি দল হইয়াছে। তাঁহাদের ভিতরেও ত ঠেঙাঠেঙি লাঠালাঠি অল্প হয় নাই। এরূপ অবস্থায় বৌদ্ধদিগের সহিত সাধারণ হিন্দুদিগের যে বিবাদ বাধিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

---

* Concepts of Monism. p. 197

আর এক কথা, বৌধধর্ম যদি হিন্দুধর্মের অঙ্গই হইবে, তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্করকে এত কষ্ট করিয়া ভারত হইতে উহার উচ্ছেদ করিতে হইয়াছিল কেন? এই সংশয়টি গুরুভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, আচার্য শঙ্কর দার্শনিক হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াই বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এ বিষয়টি বিষদভাবে আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হয়। সেই জন্য আমি "বৌদ্ধধর্ম, বৈদান্তিক ধর্ম ও শঙ্করাচার্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধে পরে ইহার আলোচনা করিব স্থির করিয়াছি। তবে আপাততঃ কিছু বলা আবশ্যক বলিয়া সংক্ষেপে কয়েকটিমাত্র কথা এইখানে বলিলাম। বৌদ্ধধর্ম ভারতে কিছু কম দেড় হাজার বৎসর বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে উহা ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়া যায়। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। উহা যে কেবল হীনযান এবং মহাযান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা নহে, উহার মধ্যে আরও অনেক উপবিভাগ বা শাখা গজাইয়া উঠে। ঐ সময় শঙ্করাচার্য্যও প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। কিন্তু খৃষ্টের শিষ্যগণ যেমন খৃষ্টের উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধদেবের শিষ্যগণও তাঁহার উপদেশ ও আলোচনাগুলি সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থগুলি পিটক নামে অভিহিত। যাঁহারা উহা লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা সাক্ষাতভাবে সকল কথা বুদ্ধদেবের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে। * ইহার ফলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্মের বিকৃতি ঘটিতে আরম্ভ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরই প্রধান প্রধান শিষ্যবর্গ সমবেত হইয়া ত্রিপিটক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু পরে বৌদ্ধধর্মের অনেক বিকৃতি ঘটিতে থাকে এবং নানামতের আবির্ভাব হয়। কতকগুলি সম্প্রদায় একেবারে নিরীশ্বর হইয়া উঠেন। সে সময় শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে বৌদ্ধগণ এই মতই অবলম্বন করেন যে, এই বিশ্বের সমস্ত বস্তুই বিকারী এবং পরিণামশীল সেই পরিণাম ধ্বংস। ইহাতে স্থায়ী সত্তা কিছুই নাই। শঙ্করাবতার শঙ্কর এই মতেরই খণ্ডন করেন। তিনি বলেন,

* In the same way there is a great improbability that the Buddhist Pitakas, as we now have them, were compiled by men who had been hearers and eye witnesse of all they record and yet it is in these Pitakas that we have the earliest and most authoritative account of Buddha's teaching now in existence.

Mrs Macdonald on Buddha and Buddhism.

"সর্বং সুখং বিদ্ধি সুদুঃখনাশাৎ
সর্বং চ সদ্রূপমসত্যনাশাৎ।
চিদ্রূপমেব প্রতিভানযুক্তং
তস্মাদখণ্ডং পরমাত্মরূপম্॥" আত্মপ্রকাশিকা ১৮

অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখের বিনাশ ঘটিলে সমস্তই সুখময় হইবে জানিবে, অসত্য বস্তুর নাশ হইলে সমস্ত চিদ্রূপ ও আনন্দস্বরূপ প্রতিভানযুক্ত ব্রহ্মই প্রকাশ পান ; অতএব পরমাত্মাই অখণ্ড। (তিনি বলেন, একমাত্র পরব্রহ্মই নিত্য সত্য। তাঁহার মতে সংসার, প্রাণিসমূহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য) বৌদ্ধদিগের ধিকৃত লয়বাদ খণ্ডন করিয়া তিনি উক্ত মতেরই স্থাপনা করেন। এ সকল কথা বিস্তৃতভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা না করিলে হয়ত আমার কথা আমি সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। যাহা হউক, উহা আমার বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। হিন্দুধর্মের অঙ্গ হইতেই যে বৌদ্ধধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে আমার সেই কথা বলাই উদ্দেশ্য। সেই জন্য আমি বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের পূর্ববর্তী অবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া এই প্রবন্ধে সেই কথারই আলোচনা করিলাম। এই সম্পর্কে আমার আর একটি কথা এইমাত্র বলিবার আছে যে, বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা আমার আলোচ্য বিষয় নহে। তাঁহাকে হিন্দুরা, আগেই হউক আর পরে হউক, কেন অবতার বলিয়া স্বীকার করি লইয়াছিলেন, তাহাই বিচার্য। জৈনধর্মও ত এককালে এই ভারতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জৈন ধর্মের প্রবর্তক আদিনাথ হইতে মহাবীর পর্যন্ত কেহ ত পরবর্তীকালে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। ইহার কারণ কি? ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। আসল কথা, স্বয়ং বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর ছিল না। ইহাও আমার বক্তব্য বিষয়।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কিছু কাল পরে হিন্দুধর্ম অরক্ষিত অবস্থায় পতিত হয়। ঐ সময়ে দ্বিজাতিদিগের এবং রাজগণের ঘোর অবনতি ঘটে। বৈদিক ধর্মের এই প্রকার অবনতি ইহার পূর্বেও অনেকবার হইয়াছিল। যাহা হউক, কলির সন্ধিকালে ধর্মহানির এইরূপ লক্ষণ পূর্ব হইতেই প্রকাশ পায়। পুরাণপাঠে জানা যায় যে, রাজা দুর্যোধনের রাজত্বকাল হইতে বৈদিক যাগযজ্ঞ সমস্ত আড়ম্বরবহুল হইয়া পড়িতে থাকে। রাজা পরীক্ষিতের সময়ে ধর্ম একপাদমাত্র হইয়া পড়ে। শুনা যায় যে, রাজা পরীক্ষিতের রাজত্বকালের কিছু কাল পরে রন্তিদেব নামক এক জন রাজা তাঁহার যজ্ঞে এত পশু বলি দিয়াছিলেন যে, সেই নিহত পশুগুলির চর্মের স্তূপ হইতে অত্যন্ত অধিক রস নিঃসৃত হইয়াছিল। উহা এত অধিক হইয়াছিল যে, সেই রস হইতে চর্মণ্বতীনাম্নী নদীর উদ্ভব হয়। এখন ঐ নদীর নাম চম্বল। উহা যমুনার

সহিত মিলিত হইয়াছে। পৌরাণিকরা বলেন, তখন ধর্ম একপাদ এবং অধর্ম ত্রিপাদ হইয়াছিল। রাজা পরীক্ষিতের আমলে কলি ধর্মের সেই এক পাদও নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ফলে এই সময়ে দ্বিজাতিগণ লোভী হইয়া উঠে এবং ধর্মের আধ্যাত্মিকতার দিক পরিত্যাগ করিয়া লাভের জন্য কাম্যকর্মের আড়ম্বর বাড়াইতে থাকে। কাযেই ধর্ম নিস্কামত্ব এবং আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত হইয়া গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে।

পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেবের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল, যথা—ধর্মের ব্যবস্থান আর দেবদ্বেষীদিগের উচ্ছেদ সাধন। তিনি যে ধর্ম প্রবর্তিত করিলেন, তাহাতে কর্মকাণ্ডকে মোটেই আমল দিলেন না, জ্ঞানকাণ্ডের উপরই বেশী ঝোঁক দিলেন। তাহার ফলে বৈদিক ধর্মে অবিশ্বাসীরা সম্মোহিত হইয়া তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের সেবা করিতে লাগিল। ফলে তাহাদের সমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ঘটে, বুদ্ধিনাশের ফলে তাহারা প্রণষ্ট হইতে থাকিল। বুদ্ধদেব অধিকারবাদ একবারে অস্বীকার করেন নাই। তিনি তিন স্তরের লোকের জন্য যে তিন দফা গুণানুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি অধিকারবাদ একবারে অস্বীকার করেন নাই। তিনি প্রাথমিক সাধকদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্য কতকগুলি গুণের অনুশীলন করিতে বলেন। কিন্তু সাধারণ লোক তাহাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। সেই জন্য তাঁহার জীবদ্দশায় ভারতে বৌদ্ধধর্ম তেমন বিস্তার লাভ করে নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধদেব ভারতে সম্পূর্ণ নূতন ধর্মমত প্রচারিত করেন। সে কথা মিথ্যা। তিনি বৈদিক ধর্মের জ্ঞানকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম প্রবর্তিত করেন। তাহা যদি তিনি না করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুরা কস্মিনকালেও তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা না করিয়া তাঁহাকে অসুর বলিয়া বর্জন করিতেন। বুদ্ধদেব এক দিকে যেমন সাধন, ভজন প্রভৃতি কাম্যকর্ম একবারে বর্জন করিয়াছিলেন, অন্য দিকে পরমাত্মার কথাটা প্রায় খুব স্পষ্টভাবে বলেন নাই। সেই জন্য এ উর্শলি (Worsley) বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব যদি তাঁহার প্রথম ভ্রমণকালে দুই জন বিশিষ্ট বেদজ্ঞ অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পাইতেন, তাহা হইলে প্রাচীন জগতের সমস্ত ইতিহাসই বদলাইয়া যাইত।

হিন্দুমাত্রই জানেন যে, হিন্দুধর্মের দুইটি স্তর আছে। একটি স্তর ক্রিয়াকাণ্ডের, আর একটি স্তর জ্ঞানকাণ্ডের। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে ক্রিয়াকাণ্ডই অবলম্বনীয়। চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে সাধককে জ্ঞানমার্গ ধরিতে হয়। শেষকালে যাহা অবলম্বনীয়, মানুষ তাহাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বা উন্নত মনে করে। ইহা মানুষের স্বভাব। কিন্তু তাই বলিয়া সাধন-পথে কার্য্যতঃ কর্মের এবং কর্মকাণ্ডের হীনতা বা অপ্রয়োজনীয়তা সূচিত হয় না। যদি কোন অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রকে উচ্চ অঙ্কের গণিত শিখাইতে চাহেন, তাহা

হইলে সেই ছাত্রকে তিনি বাল্যকালে সংখ্যা, রাশি, সঙ্কলন, ব্যবকলন প্রভৃতি শিক্ষা দিবেন। প্রাথমিক স্তরে যদি সেই ছাত্রের সংখ্যা, রাশি ও তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিষয়ে জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার রেখাগণিত বা calculus প্রভৃতি শিখিবার অধিকার বা সামর্থ্য জন্মিবে না। বুদ্ধির উন্মেষ-সাধন পূর্বক শিশুকে ধাপে ধাপে অগ্রসর করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ-সাধন পূর্বক তবে তাহাকে উচ্চ অঙ্গের অংক শিখাইতে হইবে। নতুবা গুরু যদি শিশুকে প্রথমেই বাইনোমিয়াল থিওরেম বা কণিক সেক্সন শিখাইতে বসেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিশ্রম ত পণ্ড হইবেই, অধিকন্তু ছাত্রটি একটি গণ্ডমূর্খ হইবে। সেই জন্য ভগবান গীতায় প্রথমে কর্মযোগ, পরে ভক্তিযোগ এবং শেষকালে জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়াছেন।

ভগবান সেই জন্য গীতায় কর্মকাণ্ডবিবৃতিকালে বলিয়াছেন যে—

"যাবানর্থ উপাদানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"

ইহার মর্মার্থ—(যখন দেশের সর্বত্র জল থাকে না, তখন লোক দূরস্থ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাইয়া জল দ্বারা সম্পাদ্য তাহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লয়, কিন্তু যখন সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায়, দেশে বন্যা নামে, গৃহের অঙ্গনে জল আসে, তখন তাহার আর ঐ সকল ক্ষুদ্র জলাশয়ে জলের জন্য যাইতে হয় না, তখন সে ঘরে বসিয়াই জল পায়, স্বল্পতার কূপতড়াগাদিতে তাহার কোন প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ যত দিন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, ততদিন তাহার কর্ম করিবার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু যখন তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তাহার হৃদয় কন্দরে ব্রহ্মজ্ঞানের বন্যা নামে অর্থাৎ তাহার চিত্ত জ্ঞানসাধনার ফলে ব্রহ্মজ্ঞানে সংপ্লুত হয়, তখন সেই মুহূর্ত হইতেই—সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আর কর্মকাণ্ডে রত হইবার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ তাহার বুদ্ধি বা চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপ্লুত না হয়, ততক্ষণ তাহার পক্ষে কর্ম বর্জনীয় নহে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বিশ্বাস মর্মে মর্মে উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্তই কর্মকাণ্ড মানুষের পক্ষে অবলম্বনীয়।)

ইহার পূর্বেই ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।"—ইত্যাদি

আজকাল অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, এইখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডকে নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা ভুল। যাহারা অবিপশ্চিৎ, বেদের অর্থবাদে রত এবং কামনাকুলিতচিত্ত, অধিকন্তু কাম্যকর্ম ছাড়া আর কিছুই নাই এই কথা বলেন, কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধেই ভগবান্ ঐকথা বলিয়াছেন। বিপশ্চিৎ শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্তী বিষয়কে

চয়ন অর্থাৎ সংগ্রহ না করিয়া হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে। অবিপশ্চিৎ অর্থে যাহাদের সে ক্ষমতা নাই অর্থাৎ যাহারা মূঢ় বা কূপণ্ডিত। বেদ বিষয়ে যাহাদের সম্যক জ্ঞান নাই, অর্থাৎ যাহারা কাম্যকর্ম ভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়া জানে না বা মানে না, সেইরূপ মূঢ়গণকে বুঝাইতেছে। উহাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই শ্লোকগুলিতে জ্ঞানকাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া কর্মকাণ্ডে চিরতরে রত থাকার বিরুদ্ধেই কথা বলা হইয়াছে। হিন্দুরা জ্ঞানকাণ্ডকে সাধনার শেষ পর্য্যায় বলিয়াই জানেন। কলিযুগ উপস্থিত হইবার পর অনেক ব্রাহ্মণ লোভবলে কাম্যকর্মের দিকে অধিক পরিমাণে ঝোঁক দিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং কপিল উভয়েই কাম্যকর্মের নিন্দা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব কর্মকাণ্ডকে একবারে উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

শাক্যসিংহ সাংখ্যদর্শনের ধারা ধরিয়া তাঁহার ধর্মোপদেশগুলির বিকাশসাধন করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। তাঁহার বাল্যকাল যে কপিলাবস্তুতে কাটিয়াছিল, তথায় কপিলের সাংখ্যমত যে বিশেষ প্রবল ছিল, অনেক বিশেষজ্ঞ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার উপর সাংখ্য-মত যে বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সাংখ্যকার কপিলও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কথিত। যথা ভাগবতে—

"পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥"

ভাগবত ১।৩।১০

ইহার অর্থ—ভগবান্ পঞ্চম অবতারে সিদ্ধেশ্বর কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া আসুরি নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট কালক্রমে লুপ্তপ্রায় নিখিলতত্ত্বের বিনির্ণায়ক সাংখ্যদর্শন প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছিলেন। এই সাংখ্যগ্রন্থপ্রোক্ত উপদেশ অবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেব তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন হেতু আছে কি না, এই প্রবন্ধে তাহাই বিচার্য্য বিষয়।

প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিবেৎভাবে কোন কথা বলেন নাই। ঈশ্বরের ভজন, পূজন বা আরাধনার কোন বিশেষ ব্যবস্থাই তিনি দিয়া যান নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন যে, সাধনা এবং শীলের দ্বারা মানুষ ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কপিলদেবও সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ তুলেন নাই। তবে বিজ্ঞান-ভিক্ষু-সংগৃহীত সাংখ্যসূত্রে আছে—"ঈশ্বরা-সিদ্ধেঃ।" ঈশ্বর অসিদ্ধ। অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা বা প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর আছেন, ইহা সিদ্ধ করা সম্ভব নহে। কিন্তু ঐ সূত্রে ঈশ্বর নাই, এমন কথাও নাই। এই সূত্রের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—ঈশ্বর নাই, ইহা বলা সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" না লিখিয়া "ঈশ্বরা-

ভাবাৎ" এইরূপ স্পষ্টকথা লিখিতেন। যাহা অসিদ্ধ, তাহার যে অস্তিত্ব নাই একথা বলিয়ে ভুল হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নেপচুন বা বরুণ গ্রহটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব ছিল। উহা তখনও ছিল, কিন্তু লোক তাহা জানিত না। সেইরূপ যাহা অসিদ্ধ বা যুক্তি দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহা যে নাই, তাহা মনে করা ভুল। এ ক্ষেত্রে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিজ্ঞানভিক্ষু-সংগৃহীত সাংখ্যসূত্রগুলি অনেকেই প্রামাণিক বলেন না। ইঁহারা ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য প্রণীত সাংখ্যকারিকাকে প্রামান্য গ্রন্থ মনে করেন। কারণ, গৌপাদ, শঙ্করাচার্য্য, উদয়াচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন মহাত্মগণ উহার ভাষ্য এবং টীকা লিখিয়াছেন। উহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেই জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য-প্রণীত কারিকাই আসল সাংখ্যদর্শন বলিয়া গণ্য। এই সাংখ্য-কারিকাতে ঈশ্বর অসিদ্ধ, এরূপ কোন কথা নাই বটে, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গও ইহাতে নাই। উহা যেন আলোচনার বিষয়ীভূত নহে বলিয়াই উপেক্ষিত। ইহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, কপিলদেব অবাঙ্‌মনসো-গোচরম্ ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে টানিয়া আনিয়া দার্শনিক কচকচি বাড়াইতে ইচ্ছা করেন নাই। সেই জন্য এ দেশে নিরীশ্বরাঃ সাংখ্যাঃ অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনমতাবলম্বীরা ঈশ্বর বর্জিত, এইরূপ একটা কথা আছে।

বিজ্ঞানভিক্ষুসংগৃহীত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর অসিদ্ধ কেন, তাহার একটা যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সেটা এই, "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধি" ঈশ্বর মুক্ত ও নহেন, বদ্ধও নহেন। অর্থাৎ তিনি মুক্ত এবং বদ্ধ এই দুইয়ের কিছুই নহেন; এই পরস্পরবিরোধী গুণের নেতিমূলক উক্তির দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না। এ স্থলে সাংখ্যদর্শনের কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কপিল তাঁহার দর্শনে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ তুলেন নাই, ইহা আমাদের বক্তব্য বিষয়।

এদিকে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলিতেছেন যে—

"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নহি যোগসমমং বলম্।"

অর্থাৎ সাংখ্যের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র আর নাই আর যোগবলের ন্যায় বল আর নাই। সাংখ্যদর্শনকার কপিল যদি চার্বাকাদির ন্যায় নাস্তিক হইতেন, তাহা হইলে আস্তিক হিন্দুগণ কখনই ঐ কথা বলিতেন না। বুদ্ধদেব কপিলের ন্যায় সেই বাক্য এবং মনের অতীত ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই বলিয়া বুদ্ধদেব প্রচলিত ধর্ম নাস্তিক্যধর্ম, এই সিদ্ধান্ত করা ভুল। একথা পরে বলিব।

(কপিলদেব জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলেন, একই পরমাত্মা বহুধা বিভক্ত হইয়া বহু জীবাত্মা হইয়াছেন। কপিলদেব গোড়ায় পরমাত্মাকে না ধরিয়া জীবাত্মার দুঃখত্রয়, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখ-

নিবৃত্তির কথাই বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবও জীবের ত্রিবিধ দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার ধর্মচক্র প্রবর্তিত করেন! সাংখ্যের পুরুষ নির্বিকার, নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। হিন্দুর মতও তাহাই! জীবাত্মাতে কোনরূপ গুণ ও বিকারপ্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে না। তবে সেই জীবাত্মা সূক্ষ্মভূত এবং অদৃষ্টজ সংস্কার অনুসারে সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ ধারণ করিয়া কর্মফল ভোগ করে এইমাত্র। কপিলদেব বলিয়াছেন যে, রঙ্গমঞ্চে একই নট বা অভিনেতা যেমন স্বীয় বেশের পরিবর্তন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা অভিনয় করে, সেইরূপ পুরুষ এই সংসারে ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থসাধনের জন্য লিঙ্গশরীর অবলম্বন পূর্বক বারংবার স্থূলদেহের সম্বন্ধ পাইয়া জন্মগ্রহণ এবং ভোগাদিকার্য্য সাধন করে। ইহাই তাহার পুরুষার্থসাধন! এইখানে কপিলদেব অদৃষ্ট, জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলের আভাস দিয়াছেন। বুদ্ধদেবও ঐরূপ অদৃষ্টবাদ, পুনর্জন্ম ও কর্ম-ফলবাদ স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধদেবও জীবের ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তির উপায় স্থির করিবার জন্য রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে উভয়ের মতের মধ্যে বিস্ময়কর ঐক্য বিদ্যমান।

কপিলদেব বলিয়াছেন, ধর্মের ফল ঊর্ধ্বগমন বা উন্নতি এবং অধর্মের ফল অধোগতি বা অবনতি জ্ঞানের ফল মুক্তি, অজ্ঞানের ফল বন্ধন। বুদ্ধদেবও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে জ্ঞানমার্গের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। অর্হৎদিগের জন্য তিনি যে সাধনপথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ঐ মত বুঝা যায়! অষ্টশীলের অনুশীলন মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে। তিনি তিন শ্রেণীর লোকের জন্য তিন দফা নিয়মাবলী করিয়া যান। প্রথম নিয়মাবলীর সাধনা করা কঠিন নহে। উহা সাধারণ নৈতিক নিয়ম। যথা—শৌচ ও পবিত্রতাপালন ; নিষ্ঠুরতা, লোভ এবং হিংসাবর্জন। তাহার পরবর্তী ধাপে যাহারা উঠিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে হইবে, বিলাস, কামনা ও রুচি বর্জন করিতে হইবে এবং অনাবশ্যক আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহারা কদাচ অনর্থক ও ক্ষতিকর কথা বলিবেন না। ইত্যাদি! সাধককে এইরূপ 'ধাপে ধাপে সাধনার উন্নত স্তরে উঠিতে হইবে! সাংখ্যদর্শনকার বেদোক্ত কাম্য-কর্মের বিশেষ প্রশংসা করেন নাই। তিনি ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে, বেদবিহিত যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কাম্যকর্ম করিলে যে সর্বদুঃখনিবৃত্তি হইবে, এমন কোন কথা নাই ; বরং দুঃখ হইবার কথা আছে ; কেন না, অনেক যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম হিংসাদোষে দূষিত। পশুহিংসা করিয়া যজ্ঞ করিলে, যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, যজ্ঞের ফলে নানাবিধ স্বর্গ-সুখ ভোগ করা যায় বটে, কিন্তু হিংসাজনিত পাপের ফলে কিঞ্চিৎ দুঃখও পাইতে হয়। সেই জন্য সংসারে অবিমিশ্র সুখ হয় না! অতএব আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধন দ্বারা মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এই

প্রকারে প্রকৃতির প্রভাব নষ্ট করিতে পারিলেই কৈবল্য বা নির্বাণমুক্তি লাভ করা যায়। বুদ্ধদেবও ঐ কথা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কাম্যকর্মের নিন্দা করিয়া কেবল আত্মোৎকর্ষসাধন দ্বারা নির্বাণমুক্তি লাভ করিবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার শ্রুতিজাত যজ্ঞকার্য্যের বিধানদাত্রী শ্রুতির নিন্দা করিবার ইহাই কারণ। কারণ, উহা কৈবল্য বা মুক্তি দিতে পারে না। উহার ফলভোগ শেষ হইলে আবার দুঃখত্রয়ের অভিঘাতে কষ্ট পাইতে হয়। তিনি নির্বাণকামী বৌদ্ধদিগের পক্ষে কেবল আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আত্মা যখন ঔপাধিক সুখ-দুঃখ হইতে নির্মুক্ত হয়, তখন তাহার সেই অবস্থাকে কৈবল্য বলে। কৈবল্য অর্থে আত্মার লয় নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বুদ্ধদেব-কথিত নির্বাণ কি? উহা কি আত্মার লয় (Annihilation)? সাধারণ লোক নির্বাণ অর্থে আত্মার লয়ই বুঝেন? যেমন দীপটি নিবিয়া গেলে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না, তেমনই দুঃখত্রয়াভিঘাত হইতে নিবৃত্তি পাইলে আত্মার আর অস্তিত্ব থাকে না। এই ধারণাটি সত্য কি না, তাহাই এ স্থলে বিচার্য্য। বুদ্ধদেব (নয়ঝিমা ৭২) বলিয়াছেন যে, যে অগ্নিশিখার ইন্ধন ক্ষয় পাইয়াছে, তাহার অবস্থা যেরূপ ঘটে, পাপমুক্ত আত্মারও সেই দশা হয় অর্থাৎ নির্বাণলাভ ঘটে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—ব্রহ্ম কিরূপ, তাহা নির্দেশ প্রয়াসে বলিয়াছেন,—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥"

অর্থাৎ ব্রহ্ম কূটস্থ, নিরবয়ব, দোষশূন্য, নির্লেপ, মুক্তির চরম সেতু এবং দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায় (অর্থাৎ যে অগ্নির ইন্ধন সমস্ত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহা হইতে আর শিখা উঠিতেছে না, সুতরাং শান্ত) প্রতীয়মান। নৃসিংহতাপন্যোপনিষদের উত্তর খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে,—

"হ্যয়মাত্মা চিদ্রূপ এব যথা দাহ্যং দগ্ধাহগ্নিরবিকল্পো"। ইত্যাদি,—

এই আত্মা বা পরমাত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ; দাহ্য পদার্থকে দগ্ধ করিবার পর অগ্নির যেরূপ অবস্থা ঘটে, তদ্রূপ অবিকল্প, অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ শিখাহীন গণ্‌গণে আগুন যেমন শান্ত অথচ তাপযুক্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যময়, নিষ্ক্রিয় অথচ কর্মশূন্য হইলেও শক্তিশালী। কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করিয়া ফেলিবার পর অগ্নি যেমন শিখাশূন্য সুতরাং প্রশান্ত এবং দাহিকাশক্তিসম্পন্ন অবস্থায় থাকে, পরব্রহ্মও সেইরূপ নির্বৃত অগ্নির ন্যায়। যাহা হউক, বাক্য মনের অতীত পরব্রহ্মকে বুঝিবার বা বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল এইটুকুই বলিতে চাহি যে, যে উপদেশ দানের জন্য বুদ্ধদেবকে নাস্তিকমনে করা হইতেছে, আস্তিকশ্রেষ্ঠ উপনিষদও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন। কপিলের কৈবল্য এবং বুদ্ধের নির্বাণ একই কথা। উহার অর্থ লয় (annihilation

নহে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এবং চাইল্ডার্স উভয়েই বৌদ্ধ শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়া যে যে স্থানে "নির্বাণ" শব্দের প্রয়োগ পাইয়াছেন, সেই সেই স্থানে বিচার করিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নির্বাণ শব্দের অর্থ লয় হইতেই পারে না। রোকোটফ (Rokotoff) বলিয়াছেন যে, নির্বাণ একটি সিংহদ্বারস্বরূপ। উহার ভিতর দিয়া আমরা সর্বোচ্চ, অগ্নিময়, সৃষ্টিক্ষম এবং চিরবিসরণশী অনন্ত সত্তাপ্রবাহে উপনীত হইয়া থাকি। * বুদ্ধদেব কোন কোন স্থানে নির্বাণের পর অনন্ত ও বিশুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তার সহিত মিলনের কথাও বলিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আর বৃথা তর্ক না বাড়াইয়া বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটি ইতিবৃত্তের উল্লেখ করিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যাইবে সেই বৃত্তান্তটি এই।—এক নিবিড় বন। সেই বনানীর পাশ দিয়াই এক বিস্তীর্ণ রাজপথ গিয়াছে। একদা সেই বনানীর পার্শ্ববর্তী রাজপথ দিয়া দুই জন সদ্যঃসমাবৃত্ত ব্রাহ্মণ কুমার গমন করিতেছিলেন। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন কি উপায়ে সাধিত হয়, এই বিষয় লইয়া তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর তর্ক হইতেছিল। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনই ব্রাহ্মণ্যধর্মের চরম লক্ষ্য। ঐ দুই জন ব্রাহ্মণ কুমার দুই জন স্বতন্ত্র অধ্যাপকের নিকট ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ধর্মসাধনা সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইতেছিল। সুতরাং তর্কের আর মীমাংসা হয় না। এই সময়ে বুদ্ধদেব ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নাম শুনিয়া তাঁহারা দুইজনই ঐ বিষয়টি সমাধান করিয়া লইবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। বুদ্ধদেব তাহাদিগকে অ দর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণযুবক দুইটি তখন বুদ্ধদেবের নিকট তাঁহাদের তর্কের বিষয়টি জ্ঞাপন করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের অধ্যাপকদ্বয় কি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন? ব্রাহ্মণযুবকদ্বয় বলেন, "না, তাঁহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন নাই।" তখন বুদ্ধদেব কহিলেন, "যাহা তাঁহারা দেখেন নাই, যাহা তাঁহারা বুঝেন নাই, তাহার সহিত সম্মিলিত হইবার পন্থা তাঁহারা কি প্রকারে বলিয়া দিতে পারেন?" যুবক দুইটি পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, উহা সম্ভব নহে। তাহার পর গৌতম বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"আকাশে ঐ যে সূর্য্য রহিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহারা এবং অন্য সকলেই দেখিয়াছেন, যে সূর্য্যকে আমরা সকলেই দেখিতেছি, যাহার আলোক এবং উত্তাপ আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি, তাঁহার সহিত আমরা কি উপায়ে সম্মিলিত হইতে পারি, তাহা কি কেহ বলিয়া দিতে পারেন?" ব্রাহ্মণযুবকদ্বয় কহিলেন, "সূর্য অতি দূরে অবস্থিত এবং মানুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ; সুতরাং মানুষের সহিত সূর্য্যের সম্মেলন অসম্ভব।" তখন বুদ্ধদেব বলিতে লাগিলেন, "তবেই বুঝা গেল যে, দুইটি পদার্থ সমধর্মী বা

একই ধর্মবিশিষ্ট না হইলে তাহাদের মিলন সম্ভবে না। যদিও মনুষ্যগণ ব্রহ্মের আকৃতি বা স্থান সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তথাপি তাহারা 'ব্রহ্ম কিরূপ, তাহা জানে। এখন জিজ্ঞাস্য, ব্রহ্ম কি দাম্ভিক, লোভী, কোপনস্বভাব এবং অপবিত্র? তিনি আত্মজয়ী কি না?" ব্রাহ্মণযুবকদ্বয় উত্তর করিলেন, হাঁ, তিনি আত্মজয়ী এবং তিনি দম্ভ, অহঙ্কার লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি বর্জিত। ইহার পর গৌতম বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন যে, "ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে, মনকে ত্রুটিহীন এবং পূর্ণ করিতে হইবে। দম্ভ, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। অর্থাৎ মানবাত্মাকে পরমাত্মার তুল্য করিতে হইবে।" এজন্য তাঁহার ধর্মে তিন প্রস্থ নিয়ম আছে। প্রথম প্রস্থ নিয়মাবলী যাহারা নিষ্কলঙ্ক হইতে চাহে, তাহাদের জন্য। যাহারা ধার্মিক হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় প্রস্থ নিয়ম পালন করিতে হইবে। আর যাহারা নির্বাণ বা ব্রহ্মে লীন হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে তৃতীয় দফা ভুক্ত নিয়মাবলী পালন পূর্বক সাধনা করিতে হইবে। এই আখ্যায়িকাটি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞা শ্রীমতী ফ্রেডরিকা ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাঁহার 'বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম' বিষয়ক নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পটি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে আছে (বেদ-জ্ঞানবিষয়ক সূত্তে)। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণতনয়দিগের সহিত আলোচনাকালে তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ করেন নাই,—বরং নির্বাণ অর্থে ব্রহ্মে লীন, ইহাই বলিয়াছিলেন।

তবে এ কথা সত্য যে বুদ্ধদেব পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথা বলেন নাই বা ঈশ্বরের আরাধনা বা পূজা সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই। সকল ধর্মেই ভগবানের আরাধনা, নামকীর্তন অথবা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার কথা আছে, বৌদ্ধধর্মে তাহা নাই। হিন্দু ধর্মে অধিকারভেদে কর্ম-কাণ্ডানুসারী এবং ভক্তিমার্গানুসারী সাধনের পক্ষে পূজা, আরাধনা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কেবল জ্ঞানযোগীর পক্ষে তাহা নাই।

আর এক কথা,—বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সকল কথা শিষ্যবৃন্দকে বলেন নাই। এ কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন নাটেলী রকোটফ তাঁহার "বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে বলিয়াছেন। এক দিন কোশাম্বির এক শিংশপাকুঞ্জে বুদ্ধদেব একটি বৃক্ষ হইতে কতকগুলি পত্র হাতে লইয়া কহিলেন, "আমার হাতে যে পত্রগুলি রহিয়াছে, তাহা সংখ্যায় অতি অল্প; কিন্তু গাছে যে পাতা রহিয়াছে, তাহা সংখ্যায় অনেক অধিক। (শিশু গাছের ছোট ছোট পাতার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক) সেইরূপ হে ভিক্ষুগণ! আমি যাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু তোমাদিগকে বলি নাই, তাহা সংখ্যায় গাছের পাতাগুলির ন্যায় অধিক, এবং যাহা বলিয়াছি, তাহা আমার হস্তস্থিত পত্রগুলির ন্যায় সংখ্যায় অতি অল্প।" এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, বুদ্ধদেব

উপনিষদুক্ত পরমাত্মা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথাই বলেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, পুদ্গলপন্নতিতে যে শাশ্বতবাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কার্য্যতঃ পরমাত্মার উক্তি মাত্র। প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের টীকাকার নাগার্জ্জুনও তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন যে, "তথাগত কখনও কখনও আত্মার (পরমাত্মার) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন।" তিনি যদি উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদ না মানিতেন, বা ভ্রান্তসিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে তিনি উপরি-উক্ত ব্রাহ্মণ যুবক দুইটিকে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন না। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সকল কথা একটি প্রবন্ধে বলা সম্ভব নহে। বৌদ্ধধর্মে বিশেষজ্ঞ অশ্বঘোষ এবং বসুবন্ধুও বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মার বা পরমাত্মার অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্বমাত্র। ইহা হিন্দুদিগের—

"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।"

কথারই প্রতিধ্বনি। বুদ্ধদেব কেবলমাত্র বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডে কপিলনির্দিষ্ট মতেরই অনুবর্তী ছিলেন। এ হিসাবে বৌদ্ধধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা বলিয়াই মনে হয়। মিসেস রাইস্ ডেভিডস্ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম নামক গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দার্শনিকের দিক দিয়া বুদ্ধদেব স্বয়ং কপিল এবং পতঞ্জলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন, এ কথা আমি গার্ভে ও জেকবের সহিত একমত হইয়া বিশ্বাস করি।* জেকব বলিয়াছেন যে, সাংখ্যদর্শনকার কপিল এবং গৌতম বুদ্ধ একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নহে। জেকব সাহেবের এই সন্দেহটা নিতান্তই অলীক। গৌতম বুদ্ধের বহুকাল পূর্বে সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবাস্তু সহরের নামকরণ কপিলের নামানুসারেই হইয়াছিল।** ইহাতে অনুমান হয় যে, গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থানে কপিল মতের প্রভাব অতিশয় প্রবল ছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনুমান হয় যে, শাক্যসিংহ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা। কপিলের মতের সহিত শাক্যসিংহ-প্রবর্তিত মতের

---

* I am convinced with Garve and jacobi that Buddha as a philosopher was entirely dependent on Kapila and Patanjale

Mrs. Rhys David's Budhhism Page 36.

** নাটনী রোকেটক্ষ এই উক্তিটি তাহার প্রণীত Foundation of Budhhism নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যে একতা আছে এ কথা বহু লোকই বলিয়া গিয়াছেন ; সে সকল কথা এখানে বাহুল্য ভয়ে বলিলাম না। এখন প্রশ্ন হইতেছে, বুদ্ধদেব জাতিভেদ মানিতেন কি না ? তাঁহার "ধম্মপদ" পড়িলে জানিতে পারা যায় তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণের কোন কোন গুণ থাকা উচিত, তাহা বলিয়াছিলেন। তিনি কোথাও জাতিভেদের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন নাই। বরং বিভিন্ন জন্মে মানুষ ধর্মানুসারে বিভিন্ন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, এরূপ আভাস তিনি দিয়াছেন। প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইল বলিয়া এবার আমি এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না। তিনি কাম্যকর্মের বাড়াবাড়ি দেখিয়া কর্মকাণ্ডকে বাদ দিয়া একেবারে সকলকে জ্ঞানমার্গাভিমুখ করিবার চেষ্টা করেন। হিন্দুরা বলেন, তিনি যখন ভগবানের অবতার, তখন তিনি অভ্রান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি "সাম্মোহায় সুরদ্বিষাম্" কর্মকাণ্ডকে বাদ দিয়া হিন্দুধর্মান্বেষী লোকদিগকে বিপথে চালিত করিয়াছিলেন। এই কর্মকাণ্ডকে বর্জ্জন করিয়া তিনি বিষম ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যদি বেদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্রাহ্মণের নিকট হিন্দু ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব জানিয়া লইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই কর্মকাণ্ডকে বাদ দিতে পারিতেন না। বরং তিনি উহার সংশোধন করিয়া প্রবর্তিত করিতেন। তিনি সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়া রূপে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার অধিকাংশ তর্কই বাতাসে অসি-প্রহারের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছে। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা মাত্র ছিল। উহা জ্ঞানকাণ্ডকে সাধারণের উপযোগী সরল করিবার একটা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। উহা তদানীন্তন কর্মকাণ্ডমাত্র সম্বল, আড়ম্বর বহুল এবং অঙ্গহীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়া (Reaction) রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। উহা স্বতন্ত্র ধর্ম নহে। ইহা সমগ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উদ্ভূত হয় নাই।

---

* For this reason, the greater part of Buddhist polemics is unavoidably occupied in beating the air and wasted in ignorant misunderstanding.

Buddha and the Gospel of Buddhism P. 200

বৌদ্ধ ধর্ম

এখনও একটু আছে

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পাঠানেরা তিন চারি শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটি ধর্ম ছিল। মোগলেরা দুশ আড়াইশ বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও সে কথা জানা ছিল না। ইউরোপীয়েরা জানিতেন যে সিংহল, বর্মা, শ্যাম, প্রভৃতি দেশেই বৌদ্ধ-ধর্ম চলিত,—সে ধর্মের ভাষা পালি, ধর্মযাজকেরা ভিক্ষু, বিবাহ করেন না,—ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৮১৬ সালে নেপালের সঙ্গে ইংরাজের সন্ধি হয়, সেই সন্ধির বলে ইংরাজেরা নেপালের রাজধানীতে একজন রেসিডেণ্ট রাখেন। হজসন সাহেব বহুদিন সেই রেসিডেন্সির ডাক্তার থাকেন, পরে তিনি রেসিডেণ্টও হন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের বৌদ্ধ-ধর্ম দেখিতে পান। ১৮২৬ সালে তাঁহার পণ্ডিত অমৃতানন্দ 'ধর্মকোষ সংগ্রহ' নামে একখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিয়া হজসন সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। হজসন্ সাহেব বৌদ্ধ-ধর্ম ও নেপাল সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার অনেক মালমসলা এই সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা।

হজসনের পুস্তক পড়িয়া লোকের বিশ্বাস হয়ে যে, মহাযান নামে একপ্রকার বৌদ্ধ-ধর্ম বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে চলিতেছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই সেই ধর্ম চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে—ক্রমে চীন ও তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্ম সংক্রান্ত অনেক সংস্কৃত পুস্তকের তর্জমা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে লোকের আগ্রহ আরও বাড়িয়া ওঠে। হজসন সাহেব বৌদ্ধ-ধর্মের অনেক সংস্কৃত পুঁথি নকল করাইয়া কলিকাতা, প্যারিস ও লণ্ডন নগরে পাঠাইয়া দেন। নেপাল রেসিডেন্সির আর একজন ডাক্তার, রাইট সাহেব অনেকগুলি তালপাতার ও কাগজের বৌদ্ধপুঁথি সংগ্রহ করিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন।

হজসন সাহেব কলিকাতায় যে সকল পুঁথি দেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭৮ সালে তাহার ক্যাটালগ লিখিতে আরম্ভ করেন। এক সময় তাঁহার পীড়া হয়; তিনি আমাকে তাঁহার সাহায্য করিতে বলেন। আমিও সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম। ১৮৮২ সালে তাঁহার ক্যাটালগ বাহির হয়। উহার

নাম Nepalese Buddhist Literature। ঠিক এই সময় বেণ্ডল (Bendall) সাহেব কেম্ব্রিজে যে পুঁথিগুলি দিয়াছিলেন, তাহার ক্যাটালগ করিতেছিলেন। তাঁহার ক্যাটালগ ১৮৮৩ সালে বাহির হয়। ক্যাটালগ বাহির করার পরই তিনি একবার ভারতবর্ষে আসেন এবং নেপাল বেড়াইয়া যান। তিনি কলিকাতা আসিলে আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয়।

আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম যে, এই যে এত বড় বৌদ্ধ-ধর্ম, যাহা বাঙ্গালা বেহার হইতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাঙ্গালায় তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি চলিয়া গেলে আমি মনে মনে স্থির করি, বৌদ্ধ-ধর্ম বাঙ্গালায় কি রাখিয়া গিয়াছে খোঁজ করিতে হইবে। এমনি দেখিলে ত' বোধহয় কিছুই রাখিয়া যায় নাই। বেহারে তবু ভাঙ্গা বাড়ীগুলি আছে, বাঙ্গালায় তাও নাই। এই সময় বঙ্গবাসীর যোগেনবাবু ঘনরামের ধর্মমঙ্গল প্রকাশ করেন। সে বইখানা পড়িয়া মনে হয় যে ধর্মপূজাই হয় ত' বৌদ্ধ ধর্মের শেষ অবস্থা। ধর্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উপর, তাঁর পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সম্বন্ধ বড় বেশী নাই। তখন ধর্মঠাকুরের পূজা দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়।

পাটুলির নিকট সুঁয়াগাছি গ্রামে এক ময়রার বাড়ী ধর্মঠাকুর আছেন শুনিয়া দেখিতে যাই। ঠাকুর খুব জাগ্রত, তাঁর কাছে মানৎ করিলে সব রকম পেটের অসুখ আরাম হয়। রথের মতন থাক্ থাক্ করা এক সিংহাসন, তাহার উপর ঠাকুর আছেন। ঠাকুর একখানি কাল পাথর বলিয়া মনে হইল, পাথরে যেন পিতলের Paper-fastener বসান আছে, সেগুলি ঠাকুরের চোখ। ভক্তিভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কিছু পূজা দিয়া ময়রাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাপু, তুমি কি মন্ত্রে ঠাকুর পূজা করিয়া থাক ও ঠাকুরের ধ্যান কি ?' অনেক পীড়া-পীড়ির পর সে ধ্যানের মন্ত্রটি বলিল, মন্ত্রটি এই—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো নচ করচরণং নাস্তিকায়নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম ঝ যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্বলোকৈকনাথং
তত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু নঃ শূন্যমূর্তিঃ॥

আবার শুনিলাম মুকুসিমপাড়ার কাছে জামালপুরে এক ধর্মঠাকুর আছেন। তিনি বড় জাগ্রত, যে যা মানৎ করে, সে তাহা পায়। ঠাকুর বড় রাগী, কোনরূপ ত্রুটি হইলে হঠাৎ মন্দ করিয়া বসেন। তিনি চালাঘরে থাকিতে ভালবাসেন, কেহ কোঠাঘর করিয়া দিতে চাহিলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যায়। তিনি যেখানে বসিয়া আছেন, তাহার মাথার উপর চালে খড় কখনই থাকে না। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন তাঁহার ওখানে মেলা হয়, সে মেলায় ১০০০।১২০০ পাঁঠা পড়ে, অনেক শুয়ার ও মুর্গীও পড়ে। আগে সামনেই শুয়ার মুর্গী বলি

হইত, এখন মন্দিরের পিছন দিকে হয়। এই সকল শুনিয়া জামালপুরের ধর্মঠাকুর দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইল। জামালপুর গেলাম; গিয়া দেখি সামনে দাওয়ার চালে অসংখ্য ঢিল ঝুলিতেছে; ন্যাকড়ার ফালি, কাপড়ের পাড়, পাটের দড়ী, শনের দড়ী, নারিকেল দড়ী প্রভৃতিতে ঢিল ঝোলান আছে। কেহ কিছু মানৎ করিলে, একটি ঢিল ঝুলাইয়া আসে এবং মনোরথ পূর্ণ হইলে ঢিলটি খুলিয়া লয়। আমি অনেকক্ষণ মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; আমার বোধ হইল মন্দিরের পিছনে একটা স্তূপ ছিল—তাহার গোল তলাটা মাত্র পড়িয়া আছে। তলা একেবারে মাটির সমান। মন্দিরের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড মনসাসিজের গাছ, গাছের দুটা ডালের মধ্যে একখানা একটু পালিসকরা পাথর। সিজগাছের দুটা ডালের মাঝখানে পাথরখানা অনেক দিন আগে রাখা হইয়াছিল—তারপর ডাল বাড়িয়া উঠিয়াছে—দুদিক হইতে পাথরখানাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। অনেক টানিয়া পাথরখানা বাহির করিলাম—দেখিলাম উহাতে একটি বড় কারিকুরি করা W লেখা আছে। এইরূপ Wই প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ-ত্রিরত্নের চিহ্ন ছিল। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বে একটা প্রকাণ্ড গাছ। আসশেওড়ার বনের মধ্যে একখানা পাথর পড়িয়া আছে। পাথরখানা তুলিয়া লইয়া দেখিলাম উহাতে একটি নাগকন্যার মূর্তি। কন্যার মাথার উপরে কয়েকটি নাগ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। ইহাকে মনসার মূর্তি বলা যাইতে পারে।

আমি থাকিতে থাকিতেই একজন জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিলেন। আমি দেখিলাম একটি মাটির বেদীর উপর একখানি পাথর বসান। উল্কার পাথরের মত উহা চক্‌চক্‌ করিতেছে। ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া আমি ঠাকুরের কাছে কোষাকুষি লইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলাম এবং এই সুযোগে ঘরের সব জিনিস দেখিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণ সিকা হইতে এক বড় হাঁড়ী পাড়িলেন, তাহা হইতে প্রায় সেরখানেক চাল বাহির করিলেন এবং ধুইয়া একখানা বড় থালে রাখিলেন। এটি তাঁর নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের চারিদিকে কিছু কিছু উপকরণ রাখিলেন। পরে আঙ্গুল দিয়া নৈবেদ্যটি দুই ভাগ করিয়া কাটিলেন; এইরূপ কাটায় নৈবেদ্যের মাথাটিও দুই ভাগে কাটিয়া গেল—তখন তিনি সেই দুই মাথায় দুটি সন্দেশ বসাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ও কি করিলেন? নৈবেদ্য দুভাগে কাটিলেন কেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ইনি ধর্মঠাকুরও বটেন শিবও বটেন। তাই এক নৈবেদ্য দুই করা হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি মন্ত্রে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন?" তিনি বলিলেন, "শিবায় ধর্মরাজায় নমঃ।" আমি তাঁহাকে ধর্মঠাকুরের ধ্যান পড়িতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি জানি না, যাঁর ঠাকুর তিনি জানেন, তিনি এখন এখানে নাই, আমার উপর ভার দিয়া দিয়াছেন,—আমি যাহা জানি তাহাতেই পূজা করি।"

শুনিলাম ঠাকুর একজন গোয়ালার ছিলেন। সেই পূজা অর্চা করিত, কিন্তু ঠাকুর যখন জাগ্রত হইয়া উঠিলেন তখন ব্রাহ্মণের গ্রাম, ব্রাহ্মণেরা গোয়ালার হাতে ঠাকুরের পূজা দিতে ইতস্ততঃ করে দেখিয়া, গোয়ালা একজন দুর্দশাপন্ন ব্রাহ্মণকে পূজারি নিযুক্ত করিলেন। সে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণেরই পূজা দিত, পরে অন্য জাতেরও পূজা দিতে লাগিল। কিন্তু শূয়ার ও মুর্গী বলির সময় সে আসিত না, মানৎওয়ালারা ছোট জাতের পণ্ডিত লইয়া আসিত। ক্রমে গোয়ালার বংশ লোপ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠিল, এখন ঠাকুর তাঁদেরই—তাঁহারা সব হিন্দুর আচার-ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি উহা ইংরাজী ৯৩ কি ৯৪ সালে। ৯৮ কি ৯৯ সালে আর একবার যাই। সেবার দেখি ধর্মঠাকুর মাটির বেদীতে আর নাই। তাঁহার নীচে বেশ একটি পরিষ্কার বড় গৌরীপট্ট হইয়াছে।

ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে শুনিলাম কলিকাতা সহরের মধ্যেই অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। তাহার মধ্যে ৪৫ নং জানবাজার রোডের ধর্মঠাকুর খুব প্রবল। তাঁহার একটি একতলা মন্দির আছে, মন্দিরের সামনে বারান্দা আছে; বারান্দার নীচে উঠান আছে; উঠানের পর রেলিং আছে। সিংহাসনখানি অনেক থাকের উপর। ধর্মঠাকুরের আসন সকলের উপর। তাঁহার নীচে থাকে গণেশ ও পঞ্চানন্দ। গণেশ ও পঞ্চানন্দের নীচে তিনখানি পাথর, মাঝের খানি একটু ছোট বোধ হয় ত্রিরত্নের মূর্ত্তি। এই তিনখানির নীচের থাকে শীতলা ও ষষ্ঠী, আর ঘরের কোণে জ্বরাসুর—প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ত্রিপাদ ও ত্রিশির। ধর্মঠাকুরের চোখ আছে এবং সেই তিনখানি পাথরেরও চোখ আছে। ধর্মঠাকুরের মানৎ করিলে অনেকে পাঁঠাও দেয়, কিন্তু পাঁঠাবলির সময় ধর্মঠাকুরের সামনের কপাটখানি বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, কারণ ধর্মঠাকুর পরম বৈষ্ণব, মাংস খানও না প্রাণী-হিংসাও চান না। কিন্তু পঞ্চানন্দ বড় মাংসাশী—তিনি যেমন মাংস খান তেমনি মদও খান। তালতলা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দে এই ধর্মঠাকুরের মানৎ করিয়া আপন সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। তিনিই ধর্মঠাকুরের মন্দিরের মেরামত করিয়া দিয়াছেন, সৌষ্ঠব করিয়া দিয়াছেন। পূজা আদির ব্যবস্থাও তিনি করেন। ধর্মঠাকুরের পূজারি একজন বর্ণব্রাহ্মণ। বসন্তের চিকিৎসা ও শীতলার পূজা করিয়া তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। হরিমোহন বাবুই আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া মন্দিরটি দেখাইয়াছিলেন। পঞ্চানন্দের মদ্য পান ও মাংস আহারের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন ধর্মঠাকুর যে কেন এ মাতালটাকে সঙ্গে রাখেন জানি না। ওঁর কিন্তু ক্ষমতা খুব—যে যা ধরে সে তাই পায়। কিন্তু ওটা মাতালের একশেষ। একদিন একটু মদ কম দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন হতে আর ওকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিকটস্থ সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা গেল, কিছুতেই পাওয়া গেল না। অনেকে

পঞ্চানন্দের পূজো না হওয়ায়, নিজের আহারাদি বন্ধ করিয়া দিল। শেষ একদিন একজনকে স্বপ্ন দিলেন, 'আমি জানবাজারের চৌমাথায় শুঁড়ির দোকানের একটা মদের জালার ভিতরে পড়ে আছি।' তখন ঢাকঢোল বাজাইয়া জালার ভিতর হইতে তাঁহাকে বাহির করা হইল। মহাসমারোহে তাঁহাকে আবার ধর্মমন্দিরে স্থান দেওয়া হইল। হরিমোহনবাবু গদগদ ভাবে বলিলেন, 'সেইদিন হইতে মহাশয়, আমি ওঁর জন্য রোজ এক বোতল মদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, যেন আর না পালায়'। হরিমোহন বাবুর গদগদ ভাব দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

বলরাম দের ষ্ট্রীটেও একটি ধর্মঠাকুর আছেন। কিন্তু সেখানে শীতলাই প্রবল। একটু বিশেষ মন দিয়া না খুঁজিলে ধর্মঠাকুরকে দেখিতেই পাওয়া যায় না।

এইরূপ নানা জায়গায় ধর্মঠাকুরের নানা মন্দির দেখিয়া ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধধর্মেরই অবশেষে তাহা আমার বেশ বিশ্বাস হইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইলে ত' হয় না। অন্যকে ত' বোঝান চাই। সুতরাং আমি আমার সুযোগ্য ভ্রমণকারী পণ্ডিত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ দুইজনকেই যে যে স্থানে ধর্মঠাকুরের বড় বড় মন্দির আছে, সেই সেই স্থানে পুঁথি খোঁজার জন্য পাঠাইয়া দিই। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিই, 'যদি হাকন্দ পুরাণ পাও বা ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল পাও, অতি অবশ্য করিয়া লইয়া আসিবে; এবং কোন প্রসিদ্ধ মন্দির দেখিলে মন্দিরের ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ লিখিয়া আনিবে।' রাখালচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শলপ নামক স্থানে গিয়া দেখেন যে ধর্মের মন্দিরে রীতিমত ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তি রহিয়াছে। বিনোদবিহারী ময়নায় যাইয়া খবর দেন যে ধর্মের মন্দিরে পূর্বে তিনটি জিনিস ছিল। একখানি পাথর, একটি শঙ্খ ও ধর্মঠাকুর। পাথরটি আর পাওয়া যায় না, শঙ্খটিও আর দেখা যায় না—কেবল ধর্মঠাকুরই আছেন; ধর্মঠাকুর দেখিতে কচ্ছপের মত। ইহার পর শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন—উহার নাম 'ধর্ম-পূজাবিধি"। আমার এখনকার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ পুস্তকখানি ছাপাইতেছেন। পুস্তকখানি পড়িলেই বেশ বুঝা যাইবে ধর্মঠাকুর শিবও নন, বিষ্ণুও নন, ব্রহ্মাও নন, কারণ ইঁহারা সকলেই ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ইঁহাদের ধ্যান, পূজা ও নমস্কারাদির ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে। ধর্মঠাকুর ইঁহাদের ছাড়া; ইঁহাদের চেয়ে বড়। ধর্মঠাকুরের শক্তির নাম কামিন্যা। বল্লুকানদীর তীরে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আমি বল্লুকানদীর তীরে বড়ওয়ান গ্রামে এই ধর্মঠাকুরের মন্দির দেখিতে গিয়েছিলাম। এককালে ধর্মঠাকুরের খুব বড় মন্দির ছিল। ভাঙ্গা মন্দিরের চিহ্ন এখনও অনেক জায়গায় আছে। এখনকার মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড একতলা

ঘর ; সামনে একটি বড় নাটমন্দির। মন্দিরের অধিকারী একজন স্ত্রীলোক, মুখ্খী পন্ডিত, সাধুভাষায় নাম মোক্ষদা। তিনি জাতিতে ডোম—নিজেই পূজা করেন ; তবে পাল-পার্বণে একজন ব্যাকরণজানা ডোমের পণ্ডিত লইয়া আসেন। তিনিও "যস্যান্তো নাদিমধ্যো" ইত্যাদি মন্ত্রে ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন।

ধর্মঠাকুরের মূর্তি কচ্ছপের ন্যায়। এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধ-ধর্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। বুদ্ধ বলিতে শাক্যসিংহ বুঝাইত, ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত এবং সঙ্ঘ বলিতে ভিক্ষুমণ্ডলী বুঝাইত। কোন কোন সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদের মতে ত্রিরত্ন হইত 'ধর্ম-বুদ্ধ ও সঙ্ঘ'। ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানী বুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সকল ধ্যানী বুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানী বুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইতে লাগিল। পূর্বের কুলুঙ্গীতে অক্ষোভ্য বসিলেন পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্নসম্ভব, এবং উত্তরে আমোঘাসিদ্ধি। প্রথম ধ্যানী বুদ্ধ যে বৈরোচন তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপ চারিটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানী বুদ্ধকে এরূপে লুকাইয়া রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একটি কুলুঙ্গী করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মত হইল। আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্মের প্রতিমূর্তি। সুতরাং স্তূপ, ধর্ম, এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তির সহিত ধর্মমূর্তির স্তূপ—আর কেহ নহে।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—সঙ্ঘ কোথায় গেল ? মহাযানে সঙ্ঘ বোধিসত্ত্ব রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক বোধিসত্ত্বের স্বতন্ত্র পূজা হইত। এখন ভদ্রকল্প চলিতেছে। এ কল্পে অমিতাভের পালা। অমিতাভের বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তিনিই কর্তা, তিনিই জগৎ উদ্ধার করিতেছেন, তাঁর সহস্র সহস্র নাম, তাঁর সহস্র স্বতন্ত্র মন্দির আছে। স্তূপ হইতে তাঁহাকে এখন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে—ত্রিরত্ন এখন আর নাই। মাত্র ধর্ম ঠাকুর আছেন। ঐ যে বিনোদবিহারী বলিয়াছেন যে ময়নায় পূর্বে একখানি পাথর, ধর্মঠাকুর ও শঙ্খ

পাওয়া গিয়াছিল। পাথর লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ ত্রিরত্নের বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন। শঙ্খও নাই অর্থাৎ সঙ্ঘও নাই। আছেন কেবল ধর্মঠাকুর—কচ্ছপাকৃতি।

নেপালে প্রত্যেক বিহারে ফটকের কাছে দেখিবে, এক একটি হারীতির মন্দির। হারীতিই বসন্তের দেবতা, আমাদের দেশের শীতলা। বিহারবাসী বৌদ্ধভিক্ষুরা শীতলাকে বড় ভয় করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা হারীতিকে পূজা না দিয়া, বিহারে প্রবেশ করিতেন না। আমাদের এখানেও ধর্মঠাকুরের সহিত শীতলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ধর্মঠাকুরের মন্দির সেইখানেই প্রায় শীতলা।

গণেশ ও মহাকাল নেপালে বুদ্ধ মন্দিরের দ্বার-দেবতা। যেখানে বুদ্ধের মন্দির, মন্দিরের মধ্যে ছোট চৈত্যই থাকুক বা শাক্যসিংহের মূর্তিই থাকুক—দ্বারের একদিকে গণেশ, একদিকে মহাকাল। নেপালে দুজনেই মাংসাশী, দুজনেই মাতাল। বাঙ্গালায় মহাকালের জায়গায় পঞ্চানন্দ হইয়াছেন। বাঙ্গালায় গণেশ মাংস খান না, কিন্তু পঞ্চানন্দ বড় মাংসাশী। হরিমোহনবাবু পঞ্চানন্দের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

তারপর ধর্মঠাকুরের চোখ। এখন ত লোকে Paper-fastener দিয়া ধর্মঠাকুর ও শীতলার চোখ তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্তু চোখ স্তূপের একটা অঙ্গ। স্তূপের গোল শেষ হইয়া গেলে তাহার উপর একটা চৌকা জিনিস থাকে। তাহার চারিদিকেই দুইটা করিয়া চোখ থাকে। তথাগত প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার চারিটি দিক অবলোকন করিতেন। তিনি চক্ষু হইতে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়া ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর অন্তপর্যন্ত অবলোকন করিতেন। সেইজন্য এই ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর নাম অবলোকিত। সুতরাং স্তূপের গোলার্দ্ধের উপর চারিদিকে চার জোড়া চোখ থাকাই উচিত। এখনকার ধর্মঠাকুরেরও সেইজন্য অনেক চক্ষু। ইহাতেও ধর্মঠাকুরকে পুরাণ বৌদ্ধধর্মের শেষ বলিয়া মনে হয়।

আমরা শাক্যসিংহের মতাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে কি বলিত? তাহারা আপনাদিগকে সদ্ধর্মী বলিত এবং আপনাদের ধর্মকে সদ্ধর্ম বলিত। অনেক জায়গায় দ ও ধ-য়ের যে সংযুক্ত বর্ণ তাহার পরিবর্তে শুদ্ধ ধ বলিত। অশোকের শিলালিপিতে বৌদ্ধ-ধর্মের নাম সধর্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম সধর্ম। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনের উষ্মা নামে যে ছড়া লিখিয়াছেন তাহাতেও ধর্মঠাকুরের পূজকদিগকে সধর্মী বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতও মনে করিতেন যে, ধর্মঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধ-ধর্ম এক। ছড়াটি পরে দেওয়া গেল। এ ছড়া পড়িলে আরও বোধ হইবে যে ধর্মঠাকুরের পূজা বৌদ্ধ-ধর্মের ন্যায় ব্রাহ্মণবিরোধী ধর্ম। কারণ ছড়ায় বলিতেছে "ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত

অত্যাচার করাতেই সধর্মীরা ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে আপনি আমাদের আপদ উদ্ধার করুন। ধর্মঠাকুর অমনি মুসলমান মূর্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জব্দ করিয়া দিলেন।"

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা।

জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘর বেদি
বেদি লয় কর লয় দুন।
দক্ষিণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাইর দিশ পাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড় দশবিশ হইয়া জোড়
সধর্মীকে কর এ বিনাশ॥
বেদে করে উচ্চারণ বেরায় অগ্নি বনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম সবে বলে রাখ ধর্ম
তোমাবিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইরূপে দ্বিজগণ করে ছিষ্টি সংহারণ
এ বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার॥
ধর্ম হইল যবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপি
হাতে শোভে তীরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার হইল্য ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেন দম্মাদার।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হইলা মহাম্মদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম্ফ হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল গাজি কার্ত্তিক হইল কাজী
ফকির হইল যত মুনি॥

তেজিয়া আপন ভেক নারদা হইল্য সেক
পুরন্দর হইলা মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা।
আপুনি চণ্ডিকাদেবী তিঁহ হইল্যা হায়াবিবি
পদ্মাবতী হইল বিবিনূর।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়া কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাই পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল॥

[নারায়ণ

—— —

ভগবান বুদ্ধ ও যক্ষিণী হারীতিকা

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ক্ষিতিপতি বিম্বিসার যখন ক্ষিতির সার রাজগৃহ নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন সহসা তথাকার অধিবাসীবৃন্দের উপর এক ভয়ংকর উপদ্রব আরম্ভ হইল। একদিন রাজা যখন রাজসভায় বিরাজ করিতেছেন, তখন প্রজাগণ জনকসদৃশ তাঁহার সমীপে নিজেদের বিপদের বার্তা নিবেদন করিলেন :

"হে দেব, আপনি দিব্য প্রভাবশালী। আপনার শাসনে জনগণ কেহই কোনো অন্যায় আচরণ করে না। দীর্ঘকাল আমরা পরমসুখে এই রাজ্যে বাস করিতেছি। এযাবৎ আমাদের কোনো দুঃখই ছিল না। কিন্তু সংপ্রতি এক মহান অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিরাত্রে আমাদের গৃহ হইতে কে আমাদের শিশুসন্তানদের হরণ করিতেছে। আমরা বহু চেষ্টাতেও তাহাকে ধরিতে পারিতেছি না। ধরা দূরে থাক—আজ পর্যন্ত কেহই তাহাকে চক্ষে দেখে নাই। আমাদের বিশ্বাস—ইহা কোনো প্রেত, পিশাচ অথবা ডাকিনীর কার্য। মহারাজ রক্ষা না করিলে অল্পদিনের মধ্যেই আমরা সকলেই সন্তানহারা হইব।"

প্রজাদের এই করুণ বচন শ্রবণ করিয়া নৃপতির অন্তঃকরণ সমবেদনায় ব্যথিত হইল। জনগণের এই দুঃখ তাঁহার সমস্ত হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে তিনি বলিলেন :

"যাহা ভুজবলের দ্বারা সাধিত হইবার নহে, তাহা আমি কিভাবে করিব? জানি না কিরূপে ইহার প্রতিকার হইতে পারে? আপনারা এক দিন আমাকে চিন্তা করিবার সময় দিন। কি ভাবে আপনাদের এই সন্ততিক্ষয় নিবারণ করা যায়, শুদ্ধচিত্তে ব্রতধারণ করিয়া তাহাই আমি চিন্তা করিব।"

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌরগণ পরম পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন :

"হে রাজন্, আপনার অনুদ্ধত, উদার প্রসন্ন দৃষ্টিই জনগণকে যেন সঞ্জীবিত করে। আপনার এই তাপহারী পীযূষসদৃশ মধুর বচনের কথা আর কি বলিব। আমরা এখন আশ্বাসলাভ করিলাম।"

অতঃপর নৃপতিকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার গুণ কীর্তন করিতে করিতে পুরবাসিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

নৃপতি তখন শুদ্ধচিত্তে ব্রত ধারণ করিয়া সমস্ত নগরে শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠান করাইলেন। দিবাশেষে দৈববাণী হইল :

"হারীতিকা নাম্নী এক যক্ষিণী পুরবাসিগণের সন্তানগণকে হরণ করিতেছে।"

সেই সময় ভগবান বুদ্ধ বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। নৃপতি বিম্বিসার অমাত্য ও পৌরজনের সহিত তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। দূর হইতে সেই প্রিয়দর্শন শাক্যকুমারকে দর্শন করিয়া নৃপতি প্রণত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন।

পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর নৃপতি ভগবান বুদ্ধকে পৌরজনের এই বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। মহাকারুণিক সুগত পৌরগণের সন্তাতিক্ষয়ের বিষয় অবগত হইয়া ক্ষণকাল নীরবে ধ্যানস্থ রহিলেন।

অতঃপর সহসা নরপতি বিম্বিসার ও পৌরজনকে পরিত্যাগপূর্বক পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া তথাগত যক্ষিণী হারীতিকার নিবাস অভিমুখে গমন করিলেন। হারীতিকার অবর্তমানে সেথায় উপস্থিত হইয়া তিনি যক্ষিণীর প্রিয়ঙ্কর নামক এক পুত্রকে তপোবনে অদৃশ্য করিলেন।

ভগবান অন্তর্হিত হইলে যক্ষিণী গৃহে আসিয়া তাহার পুত্রগণের মধ্যে প্রিয় পুত্র প্রিয়ঙ্করকে দেখিতে পাইল না। তখন পুত্রের অনুসন্ধানে হৃতবৎসা গাভীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে লোকালয়ে, অরণ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে লাগিল।

"বৎস, প্রিয়ঙ্কর তুমি কোথায়? কোথায় তোমার দেখা পাইব?"—তারস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে যক্ষিণী সমস্ত দিশার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধান করিল।

সমস্ত আশায় (দিকে) পুত্রকে দর্শন না করিয়া নিরাশা যক্ষিণী পর্বত ও দ্বীপসমূহ অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্র পর্যন্ত গমন করিল।

মর্ত্যভূমিতে অনুসন্ধান শেষ হইলে সে ঘোর নরকে প্রবেশ করিল। সেখানে না পাইয়া বিমান ও উদ্যানশালী স্বর্গের সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

প্রাণঘাতিনী যক্ষিণী পরিশ্রান্ত হইলেও অবিশ্রামে ইন্দ্র যম বরুণাদি লোকপালগণের সমস্ত পুরী অনুসন্ধান করিল। তথাপি পুত্রের দর্শন পাইল না।

অবশেষে কুবেরের পরামর্শে সুগতের আশ্রমে গমন করিয়া শোকার্তা যক্ষিণী পরম শরণ্যের শরণ লইল।

দুঃখার্তা হারীতিকা তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিলে ভগবান স্মিতবদনে তাহাকে কহিলেন :

"হারীতি, তোমার তো পঞ্চ শত পুত্র রহিয়াছে। একটি গিয়াছে, তাহাতে এত কাতর হইতেছে কেন?"

ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখশোকার্তা যক্ষিণী বলিল :

"হে ভগবান, এক লক্ষ পুত্র থাকিলেও এক পুত্রের ক্ষতি সহ্য করা যায় না।

পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু নাই। সেই পুত্রের বিয়োগের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে?

"যাহার পুত্র আছে সে ই পুত্রস্নেহ এবং পুত্রশোকের ব্যথা অনুভব করিতে পারে। নিতান্ত অকারণে স্বতই লোকের সন্তানের প্রতি স্নেহ হয়। সন্তান কুৎসিত হউক, বিকলাঙ্গ হউক, রুগ্ন হউক, ক্ষীণকায় হউক, জননীর নিকট সে-ই পূর্ণশশীর ন্যায়।"

বাৎসল্যবিহ্বলা যক্ষিণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ সুগত স্মিতবদনে তাহাকে কহিলেন:

"বহু সন্তানের জননী হইয়াও একটি সন্তানের বিয়োগে তুমি এইরূপ শোকার্তা হইয়াছ, তুমি যখন একমাত্র সন্তানের জননীর ক্রোড় হইতে তাহার সন্তানকে হরণ কর, তখন তাহার কিরূপ দুঃখ হয় বল দেখি?

"অলক্ষ্যে অপরের গৃহে প্রবেশপূর্বক নারীগণের সন্তান অপহরণ করিয়া, ব্যাঘ্রী যেমন মৃগশাবক ভক্ষণ করে, সেইরূপ সন্তানের জননী হইয়াও অপরের সন্তানকে ভক্ষণ করিয়াছ।

"যে আঘাতে নিজে দুঃখ পাও, সেই আঘাত অপরকেও দুঃখ দেয়—ইহা আজ তুমি অন্তরে অনুভব করিলে। অতএব আজ হইতে আর অপরকে আঘাত করিও না!

"হিংসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি বুদ্ধধর্ম সঙ্ঘের তিনটি[১] উপদেশ গ্রহণ করো তাহা হইলে তোমার পুত্রকে ফিরিয়া পাইবে।"

ভগবান ইহা কহিলে যক্ষিণী হিংসা পরিত্যাগ করিয়া শীল গ্রহণ করিল। তখন সে তাহার প্রিয়ংকর নামক প্রিয়পুত্রকে ফিরিয়া পাইল।[২]

১। (ক) চৌর্য পরিত্যাগ (খ) ব্যভিচার পরিত্যাগ, (গ) মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ।

২। হারীতিকাদমন—অবদান।

বৌদ্ধধর্ম ও নারী

নীহারকণা মুখোপাধ্যায়

বৈদিক প্রাক্‌ঐতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে নানাবিধ পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারতের ধর্ম-জীবনে ফল্গুধারার ন্যায় একটি বৈশিষ্ট্যের ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সেই ফল্গুধারা বেদ উপনিষদের ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাধকের সাধনার অমৃতরসে পুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যখনই সমাজে গ্লানি, অনাচার প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ধর্মলোপ পাইয়াছে ও অধর্ম শির উন্নত করিয়াছে, ফলে মনুষ্য সমাজের অন্তরাত্মা সত্যশিব সুন্দরের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তখনই ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিয়াছেন —

"ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সার্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে সমাজ এমনই ধর্মহীন হইয়া পড়িয়াছিল সাধারণ লোকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরাদিকেই ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিত। তাহার পূর্বে বৈদিক ঋষিগণ যে ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেবগণের আরাধনা করিতেন, সে ভাবের লোপ পাইয়াছিল। প্রাচীন ঋষিগণ বিশ্বব্যাপী দেবতার মহিমা ঘোষণা করিয়া যে ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই উচ্চ ধর্মতত্ত্ব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; সাধারণ লোকের নিকট তাহা বোধগম্য হইত না। ফলে নানা শ্রেণীর পুরোহিত পরিচালিত বলি, হোম, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি প্রচলিত অনুষ্ঠান এমন অলস, প্রাণহীন ও নীরস হইয়া পড়িল যে সেগুলি কাহারও চিত্তে ধর্মবোধের সঞ্চার করিত না। ফলে সমাজে ধর্মদ্রোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ও চার্বাক প্রমুখ ভোগবিলাসিগণের মতবাদের প্রচারের সুবিধা হইল। কিন্তু ভোগবিলাস লইয়া কোন সমাজ সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। পথভ্রষ্টের মত অসত্যের অন্ধকার যত গাঢ় হইবে, সত্যের আলোকের জন্য আকুলতা ততই বাড়িতে থাকিবে। সেই সুদূর অতীতকালে অনাবশ্যক কর্মকাণ্ডের বোঝা হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের অন্তরাত্মা যখন আকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল, সেই ক্রন্দন হিমালয়ের পাদদেশে শৈলশ্রেণী বেষ্টিত মনোরম রাজপ্রাসাদে লালিত-পালিত কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, একটি ব্যাধি-গ্রস্ত রোগী ও একটি মৃতদেহ দেখিলেন বটে, কিন্তু তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত

মানব জাতির ভয়াবহ পরিণাম ভাসিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্য কঠিন সাধনা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে; মানব সমাজের জর্জরিত দেহে তাঁহাকেই শান্তিসুধার প্রলেপ দিতে হইবে। সত্যের সন্ধান তাঁহাকেই করিতে হইবে ও সেই সত্যের আলোকে তাঁহাকেই সকলকে পথ দেখাইতে হইবে। তিনি যে ব্রহ্মচারীকে একদিন পথে দেখিতে পাইলেন, তিনি নিমিত্ত মাত্র হইলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাঁহার ভাবী জীবন চিত্র মানসপটে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ক্ষুদ্র অপরিসর রাজপ্রাসাদ আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সুন্দরী গুণশালিনী বধূ ও নবজাত পুত্র কেহই তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিল না। মানব জাতিকে মুক্তিপথের সন্ধান দিবার জন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্য-সংসারের গণ্ডী হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন।

সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২৯ বৎসর। তারপর নানাস্থান ভ্রমণ পূর্বক অবশেষে স্বচ্ছসলিলা নিরঞ্জনার তীরে উরুবিল্ব বনে উপস্থিত হইয়া তিনি পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্যে ছয় বৎসর যাবৎ ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এত ক্লেশ, এত যাতনা স্বীকার করিয়াও সিদ্ধার্থ তাঁহার চিরবাঞ্ছিত বোধি লাভ করিতে পারিলেন না: তিনি পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে কৃচ্ছ্রসাধনা, শরীর শোষণ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতির দ্বারা বাসনার অগ্নি নির্বাপিত হইতে পারে না; এই প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে হতাশ হইয়া পূর্ববৎ যুক্তপানাহার দ্বারা দেহকে বলিষ্ঠ করিয়া মনকে সত্যালোকের সন্ধানে নিযুক্ত করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। কঠোর তপশ্চরণ পরিত্যাগ করিবার জন্য সেই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাঁহার পঞ্চশিষ্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিফলতার তীব্র জ্বালা একাকী সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর তিনি নিরঞ্জনা তীরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হন। ইহার অব্যবহিত পরেই সেনানীগ্রামের এক ধনবান বণিকের পুণ্যবতী দুহিতা সুজাতা বহু সাধনার ফলে একটি পুত্রধন লাভ করিয়া সুবর্ণপাত্রে পায়সান্ন সাজাইয়া গণদেবতার পূজা দিতে আসিলেন। তিনি তরুমূলে উপবিষ্ট কৃচ্ছ্রসাধনে ম্রিয়মান তপস্বীর ধ্যানমুখর মুখের অপূর্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং ভক্তি সহকারে সেই দেবতার হস্তে পায়সান্নের পাত্র প্রদান করিলেন। সিদ্ধার্থ হৃষ্টচিত্তে সুজাতার দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। এই ভাবে পরম সাধ্বী রমণী সুজাতাই সর্বপ্রথম সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হন। অতঃপর দুগ্ধপানে শরীরে বল পাইয়া তিনি পূর্বোক্ত বৃক্ষতলে যোগাসীন হইলেন। এই সময় 'মার' স্বীয় পুত্র-কন্যা ও দলবল লইয়া নানা প্রকার প্রলোভন

ও বিভীষিকা দ্বারা সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সিদ্ধার্থ সঙ্কল্প করিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ঃ
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং।
নৈবাসনাং কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥"

এই যোগাসনে বসিয়া বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই মানুষের সকল দুঃখের কারণ এবং অবিদ্যার অপগমেই দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। সকল বাসনা, সকল কামনা ও সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধার্থের চিত্ত সত্যের বিমল আলোকে পরিপূর্ণ হইল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী—এই নাম ধারণ করেন। সকল বাসনার ক্ষয় হইবামাত্র তাঁহার চিত্ত নির্বানপ্রাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার সাধনলব্ধ অমৃতান্ন সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রথমেই তিনি তাঁহার পূর্বতম পঞ্চভিক্ষুর কথা স্মরণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার মানসে বারাণসী যাত্রা করেন। প্রথমে শিষ্যগণ সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব তাঁহাদের সমীপে আগমন করিলেন, তখন সিদ্ধার্থের তেজঃপুঞ্জ রূপরাশি দর্শন করিয়া তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সদ্ধর্মের অমৃতরসে নিজেদের হৃদয়ভাণ্ড পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইলেন।

কিছুদিনের মধ্যে বুদ্ধের শিষ্য সংখ্যা ষাট্ হইল এবং তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষের চিত্ত বহুকাল পরে একটি অমৃত উৎসের রস পাইয়া সজীব হইয়া উঠিল। হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত বৈদিক ক্রিয়-কর্মের বিরুদ্ধে মানবচিত্ত যখন বিদ্রোহ হইয়া উঠিল—তখন বুদ্ধ সেই উপনিষদের ঋষি কর্ত্তৃক প্রচারিত উচ্চতত্ত্ব ছাড়িয়া সহজ কথাবার্তায় অন্তরের পরম সত্য প্রচারপূর্বক জনসাধারণের মন জয় করিয়া লইলেন। তাঁহার ধর্ম কতিপয় পণ্ডিতের ধর্ম হইল না, সকল দেশের সকল মানবের ধর্ম হইল। তাঁহার অপূর্ব করুণা ও মৈত্রীমূলক ধর্ম ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের নানাভাষাভাষীদিগকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার আলোক মানবের গন্তব্যপথ প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। তিনি নিজে প্রবুদ্ধ হইয়া যে মহাসত্য উপার্জ্জন করেন তাহা বেদেরও অনধিগম্য, বেদবাক্য হইতেও উচ্চতর।

সেই সত্য বিশ্বজনীন জাতিভেদ বা বর্ণবিচারে সীমাবদ্ধ নহে। বুদ্ধশিষ্যের গৈরিক বসনে রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, নর ও নারী সকলেই একীভূত। একমাত্র উচ্চবর্ণের লোকে যে নির্বাণ লাভের অধিকারী তাহা নহে—উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, আর্য্য-অনার্য্য, সুর, নর—সকলেরই চিত্তে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধের সাধনা ও শিক্ষা এইরূপে জনসমাজের উপর পতিত হইয়া রাজা প্রজা সকলকে কল্যাণবর্ত্মে পরিচালিত করিত।

ছয় বৎসর কঠোর সাধনার ফলে মহাপুরুষ যে সত্যলাভ করেন—উহার আকর্ষণে যাঁহারা তাঁহার চতুর্দিকে দলবদ্ধ হইলেন তাঁহাদিগকে লইয়া 'সঙ্ঘের' সৃষ্টি হয়। সঙ্ঘের প্রভাব সমগ্র দেশের উপর পতিত হইল। বৌদ্ধসংঘ প্রাচীন ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জনসংঘ। বৌদ্ধযুগে ভারতে যে সভ্যতার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল—সাধনানিরত বৌদ্ধভিক্ষুগণের নিভৃতনিবাস হইতেই সেই ধারা উত্থিত হইয়াছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার সুফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

ভগবান বুদ্ধ নরনারী উভয়কেই তাঁহার সদ্ধর্ম প্রচারের তুল্য অধিকার প্রদান করেন। বুদ্ধসঙ্ঘে প্রথমে রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না। বুদ্ধদেবের বিমাতা মহাপ্রজাপতি গোতমী পাঁচশত শাক্যমহিলা সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বুদ্ধ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাঁহার আশংকা এই—ভিক্ষুণীরা সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে তাঁহার ধর্মের স্থায়ী পবিত্রতা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে। নীতির যাহাতে ব্যতিক্রম না হয়—সেজন্য বুদ্ধের তীব্র উৎকণ্ঠা ছিল। বুদ্ধদেব বৌদ্ধতপস্বিনীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন। মনুর যে বিধান—"শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অধীন, স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না"—ভিক্ষুণীর প্রতি বুদ্ধের অষ্টানুশাসন ইহারই অনুযায়ী। সন্ন্যাসিনী হইয়াও স্ত্রীলোকের কোনো বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই। অতঃপর আটটি অনুশাসন পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া রমণীরা সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। এই অনুশাসনগুলি পালনে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল. এইভাবে বহু সাধ্যসাধনার ফলে বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিক্ষুদলে গ্রহণ করিয়া প্রজাপতির মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন এবং স্বীয় স্ত্রী মহাপ্রজাপতিকে তাঁহার প্রথম স্ত্রীশিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও রমণীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই মস্তকমুণ্ডন করিয়া পীতবসন পরিধান করেন। ভগবান বুদ্ধ জননী গোতমীকে ভিক্ষুণী সঙ্ঘের শিরোমণি এবং পরিচালিকা নিযুক্ত করেন। অতঃপর নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা তিনি শীঘ্রই প্রাথমিক এবং

বিশ্লেষাত্মক জ্ঞানের সহিত মহত্ব লাভ করেন। যে পাঁচশত ভিক্ষুরমণী তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারও যথাসময়ে মহত্ব লাভে সমর্থ হন।

নারী সম্প্রদায়ের ভিতর শাক্যপরিবারের মহিলারাই সর্বাগ্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব জানিতে পারেন। শাক্য নারীদের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া বহুবিবাহপ্রথা তাঁহাদের মধ্যে আইনবিরুদ্ধ ছিল—সেজন্য শাক্যরমণীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ ছিল। বুদ্ধের জ্ঞান, বৌদ্ধধর্ম নিহিত সহজ-সত্য, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার তাঁহাদের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এই সকল কারণে তাঁহারা গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগপূর্বক আত্মার মুক্তি কামনায় ভিক্ষুণীর জীবন গ্রহণ করিয়া সুকঠোর সংযম ও সাধনার দ্বারা মহত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। তথাগতের সঙ্ঘের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল রাজা শুদ্ধোধনের মৃত্যুর পর বুদ্ধের পত্নী যশোধরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। যে সমস্ত ভিক্ষুণী অসাধারণ দৈবশক্তির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যশোধরাকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। বুদ্ধদেবের পুত্র রাহুলও নবধর্ম গ্রহণ করেন।

যে সকল রমণী বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিতা হইয়াছিলেন তাঁহারা যে শিক্ষাদীক্ষায় তাহাদের পুরুষ ভ্রাতাদের সমকক্ষ ছিলেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধসাহিত্যে শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নারীজাতি কি অসাধারণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন—তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা 'থেরী' অর্থাৎ স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা বলিয়া সকলের গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। প্রাচীন ভারতের থেরী-সঙ্ঘ এক অপূর্ব প্রতিষ্ঠান ছিল। শত শত থেরী স্বাধীন চিন্তা-শক্তি দ্বারা সদ্ধর্ম প্রচার করিয়া লোকের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছেন। ভিক্ষুণী বা থেরীরা ধর্মনিষ্ঠা, মনস্বিতা ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। পালি ধর্মগ্রন্থসমূহের মতে থেরীগাথার শ্লোকগুলি ঋষিকল্পা নারীদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। অনেকানেক স্থবিরা তপস্বিনী গৌতমের জীবদ্দশায় থেরীগাথা রচনা করেন। অনেকগুলি গাথা অতি সুন্দর ও লেখিকার সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। থেরী পূর্ণা গৌতমীর মুখে ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভ করেন। তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"পূর্ণে, পূর্ণ কর প্রাণ পূর্ণিমার চন্দ্রসম।
পূর্ণ প্রজ্ঞালোকে দূর কর তুমি অজ্ঞতার তম॥"

থেরীদের স্বরচিত শ্লোকগুলি ধর্মানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করে।

বক্তৃতা করিতে পারিতেন এমন কয়েকটি রমণীর নাম বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায়। রাজা বিম্বিসারের মহিষী ক্ষেমা অতিশয় সুন্দরী, শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী

ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল এবং পাঁচশত ভিক্ষু তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। তিনি বিনয়গ্রন্থ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে নারী দেহের সৌন্দর্য্যের অসারতা বুঝাইয়া দিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেন। পরে ক্ষেমা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং গভীর জ্ঞানের জন্য যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন। ভদ্রা চেণ্ডুলকেশা পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তাঁহাদের জ্ঞান-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। বুদ্ধদেবের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্ত ব্যতীত অপর কেহ তর্কে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। ধর্মাশোকের কন্যা সংঘমিত্রা ত্রিবিধ বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন। বিনয় পিঠকে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অন্য লোককে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিতেন। মহাথেরী সংঘমিতার নিকট সিংহল রাজার পত্নী অনুলা তাঁহার পাঁচশত সহচরী পরিবৃতা হইয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন এবং প্রজ্ঞালাভে সমর্থ হন। রাজা শ্রীহর্ষের ধর্মসভায় তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রী অপরোক্ষভাবে যোগদান করিতেন। যে সমস্ত ভিক্ষুণী বিনয় পিঠক আয়ত্ত করেন, পটাচারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারিণী। তিনি অতি প্রতিভাশালী নারী ছিলেন। পটাচারা থেরী হইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আপনার অনন্যসুলভ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচশত শিষ্যা ছিলেন, তাঁহারা নানা পরিবার ও নানাস্থান হইতে আগমন করেন। বহু শোক-বিহ্বল রমণীকে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে তাঁহার স্বামী, দুই শিশু পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা সকলকেই হারাইয়াছিলেন। পরিশেষে এই শোকোন্মত্তা নারী বুদ্ধের সদ্ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া নবজীবন লাভ করেন।

বুদ্ধের ধর্ম সমাজের সকল স্তরের নরনারীর উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ধর্মের মর্মস্পর্শী বাণী শ্রবণ করিয়া অনেক পতিতা নারী জ্ঞানবৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। এই ধর্মের পুণ্যপ্রবাহ অনেক নর্তকী ও বারবনিতার অন্তরের পাপরাশি ধৌত করিয়া শুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দেয়। বৈশালীর সুপ্রসিদ্ধ বারবনিতা অম্বপালীর গৃহে ভগবান বুদ্ধ আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি মহাপুরুষের মধুরবাণী শ্রবণ করিয়া নূতন জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড পুরী তিনি শ্রবণদের বাসের জন্য দান করেন। অড্‌চকাশী নামে বারাণসীতে আর একজন সুবিখ্যাত বারবনিতা ছিল। সে তাহার শেষ বয়সে ভিক্ষুণীজীবন গ্রহণ করে। এইরূপে একাগ্রচিত্তে বুদ্ধবাণী শ্রবণ করিয়া বহু সুন্দরী স্ত্রীলোকের নশ্বর সৌন্দর্য্যের অহমিকা নষ্ট হয় এবং ক্রমে তাঁহারা অর্হৎ হন। জনসাধারণও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। যৌবনের প্রারম্ভে পতিতা নারীরূপে তাঁহাদের যে জীবন আরম্ভ হয়, জীবনের শেষে তাহাই ঋষির ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠে।

ক্রীতদাসীরা বুদ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের মহিষী শ্যামাবতীর খুজ্জুত্তরা নামে ক্রীতদাসী রাণীর প্রদত্ত অর্থ কাহাপনের মধ্যে প্রত্যহ চারি কাহাপনের ফুল ক্রয় করিয়া অবশিষ্ট চারিটী কাহাপন চুরি করিত, একদিবস সে বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম শ্রবণ করে এবং পবিত্রতার প্রথম সোপানের ফল লাভ করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করে। অতঃপর দাসীর নিকট হইতে ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া রাণী শ্যামাবতী সোতাপত্তি ফল লাভ করেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে সকল সাধ্বী কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে, বিশাখা তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। বুদ্ধদেবের দানশীলা নারী ভক্তদের মধ্যে মিগারের মাতা বিশাখাই সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিতা ছিলেন, ততদিন পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঔষধপথ্য প্রদান, অনুচরবর্গকে অন্নদান, ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষান্ন বিতরণ এবং ভিক্ষুণীদিগকে বস্ত্রদান করেন। ভিক্ষুদের প্রতি বিশাখার অনুগ্রহের অন্ত ছিল না। বৌদ্ধসঙ্ঘ বিশাখার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী ছিল।

সুপ্পিয়া নামে বারাণসীর এক গৃহস্থের পত্নী সর্বদা বিহারে গমন করিয়া ভিক্ষুদের স্বাস্থ্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। একদা একজন ভিক্ষু জোলাপ গ্রহণ করিয়া সুপ্পিয়াকে তাঁহার আহারোপযোগী কোনও মাংস রন্ধন করিয়া দিতে বলেন। তিনি রন্ধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হন বটে—কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইয়াছে এরূপ কোন প্রাণী খুঁজিয়া পাইলেন না। অতঃপর নিজের উরুদেশ হইতে মাংস কাটিয়া তাহাই রন্ধন করিয়া তিনি ভিক্ষুকে আহার করিতে দিলেন। তাঁহার এই আদর্শ ত্যাগের জন্য ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন এবং বুদ্ধদেবের দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহার ক্ষতও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল।

আর একসময় এক রাণী তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তান হারাইয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম কিসাগোতমী, সেই মৃতদেহটি লইয়া তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলেন—"তুমি যদি এরূপ গৃহ হইতে একটি সর্ষপ আনিতে পার যে গৃহে কেহ কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই—তবে আমি তোমার পুত্রকে প্রাণদান করিব।" কিসাগোতমী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর বুদ্ধ তাঁহাকে জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। কিসাগোতমী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া বুদ্ধের চরণে প্রণতা হইলেন।

এইরূপে অনেক দুঃখিতা মাতা, সন্তানহীনা বিধবা এবং অনুতপ্তা বারবনিতা গোতম বুদ্ধের ধর্মের আকর্ষণী শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণপূর্বক দুঃখ, তিরস্কার ও অনুশোচনার হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই সকল কোমলদেহা নারী বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিয়মিতরূপ

শীলানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র জীবনযাপন করেন। ধনীর স্ত্রী অলস জীবনের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া গৃহত্যাগের সংকল্প করেন এবং দরিদ্রের পত্নীরাও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথের অনুসরণ করিতে বাধ্য হন। এইভাবে স্ত্রীলোকেরা প্রজ্ঞা গ্রহণপূর্বক নিত্য বিদ্যা, বুদ্ধি ও পুণ্যবলে শ্রমণাপদে আরূঢ় হইতে পারিতেন, এমন কি অর্হৎ হইবারও অধিকারিণী ছিলেন। শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি 'মার' এই সকল বৌদ্ধতপস্বিনীদের প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহারা প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং দুশ্চরিত্র লোকের দ্বারা ইহাদের মনে কামলিপ্সা উদ্রেক করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টাও অনেক সময় ব্যর্থ হইয়াছে। থেরী শুভাজীবক নামক এক ব্যক্তি আম্রকাননে বেড়াইবার সময় এক ধূর্তের হস্তে পড়িয়াছিলেন। অসচ্চরিত্র লোক তাঁহার সতীত্ব নাশ করিতে চেষ্টা করে। তারপর শুভা তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া ধূর্তের হস্তে প্রদান করেন। ইহা দেখিয়া সেই লোকটি আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এইরূপে ধূর্তের মনের পাপলালসা দূর হয়। শুভা ধূর্তের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া ভগবান্ বুদ্ধের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে ও তাঁহার কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করেন। অতঃপর তিনি ভগবান্ তথাগতের কৃপাপ্রার্থী হইয়া উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের সময়ে স্ত্রীলোক এইভাবে সাংসারিক জীবনের সুখলালসা পরিহারপূর্বক অতীন্দ্রিয় রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন—বিশেষ করিয়া 'মার' যখন নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়লালসার দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ ও বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিত, তখন তাঁহারাই মুখে মুখে পাণ্ডিত্যভাবময় শ্লোকসকল রচনা করিয়া গান করিতেন।

থেরীগাথা এবং তাহার ভাষ্য হইতে জানা যায়, কি ভাবে স্ত্রীলোকের পুনর্জন্মের ভয়ে পিতামাতা, স্বামী এবং প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণীলীলা যাপন করিতেন, অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে নানাপ্রকার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিক দুঃখ-মুক্তির কামনায় রমণীরা সন্তান, পিতামাতা, স্বামী অথবা প্রভুর প্রতি কর্তব্যের পথে অবহেলা করিয়াও সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বহু স্ত্রীলোক সদ্ধর্ম পালনপূর্বক অন্তরে সুখের আশায় বা মৃত ফকীরের কল্যাণকামনায় তিনি এবং ভিক্ষুণীদিগকে প্রচুর অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য দান করেন। রমণীসুলভ ধর্মগুলি বিশেষভাবে থেরীদের জীবনের ভিতর দিয়াই উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপে সকল স্ত্রীজাতির উপর কি ধন, কি নির্ধন, কি বিবাহিতা, কি, অবিবাহিতা বুদ্ধের ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারত ইতিহাসের সেই গৌরবময় যুগে গঙ্গাপ্রবাহিত প্রদেশে শত শত থেরী বুদ্ধের অমৃতমধুর ধর্মকথা প্রচার করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিয়াছিলেন। সেই সকল বৌদ্ধতাপসীগণ শীলবতী, বহুশাস্ত্রে পটু, বক্তা ও সুগত ধর্মে রতা বলিয়া জনসমাজে বহু

মানের পাত্রী ছিলেন। ইঁহারা জ্ঞানগৌরবে ও ধর্মগৌরবে গরীয়সী ছিলেন। তথা অবিবাহিতা বালিকাকে বিদ্যাপীঠে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিনা—সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবারের মধ্যে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্মশাস্ত্রে ও ললিতকলায় নারীরা পারদর্শিনী ছিলেন। নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দেশে দেশে ধর্মপ্রচার করিতেন—তখন তাঁহাদের মধ্যে অবরোধ বা অবগুণ্ঠন ছিল না। ভগবান্ বুদ্ধের চরিত্রের উদারতা এমন বিশ্বব্যাপিনী ছিল যে—তাঁহাকে সকলেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। তিনি নারীজাতিকে ধর্মপ্রচারের পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়া নারীত্বকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

উদ্ভবকাল হইতে প্রায় পনর শত বৎসর ধরিয়া এই সদ্ধর্ম ভারতবাসীর চিত্তে আলোক দান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম কেন তাহার আপন সত্তা রক্ষাপূর্বক বিশিষ্ট ধর্মরূপে হিন্দুধর্মের পার্শ্বে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিল না—ইহা ভারত ইতিহাসের এক অমীমাংসিত সমস্যা। বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইবার কারণ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত পোষণ করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান, বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব, মুসলমান ধর্মের অভ্যুত্থান, বৌদ্ধধর্মে ভজন পূজনের অভাব, তান্ত্রিককাণ্ডের প্রভাববশতঃ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা, ভিক্ষুদের সহিত ভিক্ষুণীদের এবং ভিক্ষুণীদের সহিত সাধারণ লোকের মেলা-মেশায় বহুবিধ অশান্তির সৃষ্টি—এইগুলি বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি বা অবনতির অনেকগুলি কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এই সদ্ধর্ম এদেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই—ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে স্বীয় সত্তা নিমজ্জিত করিয়া দিয়া ইহাতে নূতনত্ব দান করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুকরাই যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণপূর্বক অহিংসা ধর্মের মহিমা প্রচার করেন। 'প্রাণী-হিংসা করিব না'—ইহা একটি বৌদ্ধশীল। সেজন্য কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

> "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
> সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
> কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে

বৌদ্ধেরাই সংযম, সাহস, স্বার্থত্যাগ, নিষ্ঠা ও জ্বলন্ত ধর্মানুরাগের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সদ্ধর্মের মহিমা হিন্দুসমাজ হইতে কখনই লুপ্ত হইবার নহে—সেই ধর্ম ভারতে চির-রঞ্জিত থাকিবে। এখনও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও সেই মহাপুরুষের শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সৌরভ ও পবিত্রধর্মের বাণী অসংখ্য নর-নারীর চিত্ত হরণ করিতেছে।

[ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫]

মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম

কালীপদ মিত্র

নৈরঞ্জার নদীতীরস্থিত বোধিদ্রুমমূলে ধ্যাননিমগ্নাবস্থায় শাক্যসিংহ গৌতম প্রথম সম্বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাহার পর বারাণসীতে আসিয়া প্রথমে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি যে নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাই প্রচার করেন। যে "মধ্যম পথের" বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা "ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্ত" পাঠে অবগত হওয়া যায়। নির্বাণ লাভের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার ধর্ম প্রচারের বিরাম ছিল না। প্রতিদিন অক্লান্তভাবে ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া সুমধুরস্বরে তৎপ্রবর্তিত চতুরার্যসত্য, পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গমার্গ, সপ্তবোধ্যঙ্গ, প্রভৃতি নির্বাণপথের সোপান সমূহ নির্দেশ করিয়া বহু ভাগ্যবানকে অর্হত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় বলিয়া দিতেন। কখন বা শ্রাবস্তীতে তাঁহার প্রিয় উপাসক অনাথ পিণ্ডিকের জেতবনারামে, কখনও বা রাজগৃহে বেণুবনারামে, কখনও বা শিশুমার পর্বত সন্নিহিত ভেসকলাবনে, কখনও বা কৌশাম্বীস্থিত ঘোষিতারামে তাঁহাকে ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে দেখিতে পাই। আনন্দ, কশ্যপ, সারিপুত্র, মৌদ্গলায়ন প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ তীর্থিকগণের ভ্রান্ত ধর্মপন্থার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া সদ্ধর্মের প্রচার পরিকল্পে বহু যত্ন করিয়াছিলেন, অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। সমগ্র মগধরাজ্যে বৌদ্ধধর্মের ভূয়িষ্ট প্রচার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তবুও তাহা অন্যান্য ধর্মের একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে নাই ; কেবলমাত্র মগধেই সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রাপ্তির পর হইতে রাজা অশোকের সিংহাসনারোহণের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বৈদিক, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মসমূহের সহিত পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। গিরিলিপি সমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় যে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও সমুত্থান দর্শনে অভিলাষী হইলেও সামান্য "পাসংডে"র (ধর্মসম্প্রদায়ের) অবমাননা তো করিতেন না-ই, বরং তাহাদের যথোচিত সম্বর্ধনা করিতেন। কিন্তু উত্তরকালে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির জন্য একমাত্র সম্রাট্ অশোকের উদ্যমকেই (বুত্থান) মুখ্য কারণ বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি অশোকের আবির্ভাব না হইত যদি তিনি বৌদ্ধধর্মকে সাম্রাজ্য-ধর্মের (State Religion) সুবর্ণপীঠে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহার বৃদ্ধির জন্য সম্যক্ উদ্যম না করিতেন, তাহা হইলে কি আজ বৌদ্ধধর্ম সমগ্র পৃথিবীর তৃতীয়াংশ পরিব্যাপ্ত করিয়া অসংখ্য নরনারীর সেব্য, পূজ্য, আরাধ্য হইত ? বৌদ্ধধর্ম তাহা হইলে আসমুদ্র ভারতবর্ষ কেন, মগধের

সীমাও লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত কিনা সন্দেহ—বোধ হয় আজ সম্প্রদায় বিশেষের গণ্ডীর ভিতর নিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের বহু অখ্যাত অজ্ঞাত ধর্মসমূহের অন্যতম হইয়া রহিত। যে বোধিদ্রুমমূলে শাক্য গৌতম তাঁহার প্রথম উদ্বোধন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার শাখ ভগ্ন করিয়া যদি সংঘমিত্রা ভারত হইতে নীলাম্বুবেষ্টিত তাম্রপর্ণী দ্বীপে উপস্থিত হইয়া অনুরাধাপুরে প্রোথিত না করিতেন, যদি সিংহল-রাজদুহিতাগ্র রাজকুল-যোষিদ্‌বর্গকে উপসম্পদা না দিতেন, যদি কাষায়ধারী মহেন্দ্র সুদূর মগধ হইতে আসিয়া সিংহলরাজ দেবানাম্ পিয়তিসসকে বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত না করিতেন, তাহা হইলে কি আজ অনর্ঘ বিহার গাত্রে শিল্পকলার চরমোৎকর্ষ জাতকচিত্র সমূহের বিকাশ হইত? না মহাবিহার, রুবনবেলি, ডাগব প্রভৃতি অপূর্ব পৌর্ত্ত ও ভাস্কর্য্যশিল্পের স্ফূর্ত্তি হইত?

কলিঙ্গবিজয়ের অব্যববহিত পরেই অশোক উপাসকাবস্থা অতিক্রম পূর্বক উপসম্পদা গ্রহণের পর সংঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। যেমন তিনি সাম্রাজ্যের কর্ত্তা ছিলেন, সেই রূপই সংঘেরও কর্ত্তা থাকিয়া তাহার সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য ব্যবসিত হইলেন। সাঁচি ও সারনাথ লিপি পাঠে জানিতে পারি যে 'সংঘের' সমগ্রতা রক্ষণের জন্য তিনি কিরূপ যত্নপর ছিলেন, এবং সংঘের মধ্যে যাহারা বিবাদ বিচ্ছেদ জন্মাইয়া উহাকে হীনশক্তি করিবার প্রয়াস পাইত,—কাষায়ধারণের অনুপযুক্ত সেই বিরোধজনয়িতা ব্যক্তিগণকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কিরূপে শুভ্রবসন পরিধান করাইয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেন। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে প্রতিকূল বিঘ্ন সমূহকে নাশ করিয়া ধর্মের প্রসারের নিমিত্ত পশ্চিমে যবনরাজ্যসীমাস্পৃষ্ট এশিয়া মাইনর হইতে পূর্বে সুবর্ণভূমি পর্য্যন্ত, উত্তরে হিমানীমণ্ডিত "হিমবন্ত" প্রদেশ হইতে দূর দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূমিভাগে তাঁহার বিরাট রাজশক্তির চালনা করিতেন। যবনরাজ এণ্টিয়োক্সথিয়স, ইপাইরসের গ্রীকরাজ, মিশরের রাজা ফিলাডেলফস ও রাজভ্রাতার সহিত তাঁহার সৌহার্দ ছিল এবং তাঁহার প্রভাবে তত্তদ্দেশ সমূহে তৎপ্রতিষ্ঠিত সদনুষ্ঠান সকলের আচরণও হইত। ইহাতেই পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে প্রসারতা লাভের পন্থা সুগম লইয়াছিল। অবশ্য অশোকের অনেক পরে মধ্য-এশিয়া বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত হয়। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপানও ক্রমে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে। সিংহলদেশে প্রচলিত কিম্বদন্তীতে বৌদ্ধধর্ম যাচকদের একটা তালিকা পাওয়া যায়। কিম্বদন্তী বলিয়া একেবারে তাহা ভিত্তিহীন নহে—ঐতিহাসিক সত্যেরও তাহাতে নিদর্শন আছে।* ঐ তালিকা হইতে জানা যায় সম্রাট্ অশোক

* কিম্বদন্তীতে উল্লিখিত বৌদ্ধ যাজকগণের দুই একজনের নাম সাঁচিস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত কিরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় তাঁহার উদ্যোগ ব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্ম "জগতের ধর্ম" (World-Religion) হইতে পারিত না। আর তাহা হইলে ফা-হিয়ান, সন-ইয়ুঙ, উয়ান-চোয়াঙ, ইৎসিন প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকগণ দুর্গমপথের প্রভূত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অশেষ দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া তাহাদের "গুরুর" জন্মভূমি তীর্থস্বরূপ ভারতে আসিতেন না ; প্রধান প্রধান শিক্ষার পীঠস্থানে চারি-পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান পূর্বক যত্নের সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বিনয়াদি ধর্মপুস্তক সমূহের অধ্যয়নও করিতেন না। এই সব ধর্মপ্রাণ পরিব্রাজকগণ শুধু এখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যাহাতে নিজ দেশে গিয়া অবসরক্রমে সংস্কৃতে লিখিত পুঁথিগুলি নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সাহায্যে উয়ান-চোয়াঙ এত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন যে তাহা বহিতে কুড়িটা সবসকায় অশ্বের আবশ্যক হইয়াছিল। অশোক না জন্মিলে কি বৌদ্ধধর্মের এই বিস্তৃতি ঘটিত ?

যে সমস্ত চীন পরিব্রাজকগণ চীন হইতে ভারতবর্ষে যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাস্তা ছিল মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের সময় বসুবন্ধু প্রমুখ যে সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গিয়াছিলেন, এবং ভারত হইতে যে সমস্ত দূতের গমনাগমন হইয়াছিল, তাহাও সেই মধ্য এশিয়ার পথেই। হর্ষবর্ধনের সময়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কানাকুব্জের বিপ্লবের সময়ে যে চীন সেনাধ্যক্ষ হর্ষবর্ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া অর্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সেই মধ্য এশিয়ার উপর দিয়াই আসিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক স্থলপথে ভারতের সহিত বহির্ভারতের যে আদান প্রদান হইয়াছিল তাহার সঙ্গমক্ষেত্র এই মধ্য এশিয়া। তাই মধ্য এশিয়া প্রাচ্য জগতের যেন একটা মহীয়ান তীর্থস্বরূপ। কেন না, এই পুণ্য-প্রণালীতে জগতের সভ্যতার নানা ধারা আসিয়া মিশিয়াছে। ভারত, চীন, তিব্বত, গ্রীস্, রোমের অদ্ভুত সম্মিলন এই পুণ্যক্ষেত্রেই সংসাধিত হইয়াছে।

এক সময় এই মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের কতটা প্রসার হইয়াছিল, তাহা দিক্-চক্রবালাবলম্বী ভীষণ মরুর বালুকা সমাধি হইতে উদ্ধৃত 'জ্ঞাত' 'অজ্ঞাত' বিবিধ ভাষার লিখিত পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। যা মুরল ষ্টাইন তাঁহার Ancient Khotan, Sandburied plains of Khotan, এবং Ruins of Desert Cathay নামক পুস্তকগুলিতে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষোক্ত পুস্তক-খানি হইতে আমি কেবলমাত্র দুই চারিটির স্থানের বিবরণ উদ্ধৃত করিব। চীন পরিব্রাজক উয়ান-চুয়াঙ স্বীয় মাতৃ-ভূমিতে ফিরিবার সময়ে যে-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় ষ্টাইন সাহেবও সেই পথেরই অনুবর্তী

হইয়াছিলেন। শতদ্রু ও সিন্ধু নদের তীর হইতে যাত্রা করিয়া সোয়াট, ভির ও চিত্রলের মধ্য দিয়া তিনি রক্সস্ নদীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত আসেন। তাহার বিকাশঘর, ইয়ারখাণ্ড, কারঘালিক, খোটান, খাদাখক, নিয়া, এনডিয়ার, চারচান, চাকলিক, লপ মরু, লপ-নর, তারিম অববাহিকা, মিরণ, টুন হোয়াঙ্গ, আনন্দ ও "অসংখ্য বুদ্ধের" উপত্যকার ভিতর দিয়া পশ্চিম দিকে উপস্থিত হন। কত বাধা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে যাহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল তাহা পড়িতে পড়িতে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই আশাতীত রত্নলাভ করিয়া, তিনি দুঃখ কষ্টকে আমার মধ্যেই আনেন নাই। এই সমগ্র প্রদেশ একসময় সংখ্যাতীত বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দিরে পরিকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কেবল তাহার অস্থি ও কঙ্কাল অবশিষ্ট থাকিয়া সতের আঠার শতাব্দীর পূর্বে যে সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল, যে বিশিষ্ট শিল্প কলার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

খাদালিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক বৌদ্ধ বিহারের অভ্যন্তর কাগজে লিখিত কতকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে। অক্ষরগুলি বড় বড়,—'গুপ্ত' অক্ষর,—ভারতীয় অক্ষরেরই মধ্য-এশিয়া সংস্করণ। সুসংরক্ষিত অবস্থায় শুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত পুথির তিন খানি পাতাও রহিয়া গিয়াছে। অন্যান্য কতকগুলি পুথির অক্ষর ভারতীয় ব্রাহ্মী অক্ষর বলিয়া বিবেচিত হয়।

১৬ ইঞ্চি লম্বা ১১ ইঞ্চি চওড়া কতকগুলি কাগজের পৃষ্ঠে, সুন্দর চীন অক্ষরে চীন বৌদ্ধ পদ ও তাহারই অপর পৃষ্ঠে ব্রাহ্মী-অক্ষরে সেই পদই লিখিত হইয়াছে। অতি নিপুনতার সহিত চিত্রিত শত শত কাষ্ঠ-খণ্ড বৌদ্ধ অর্হৎ-বৃন্দের প্রতিমূর্তির পরিণাম দর্শাইতেছিল। বিহার গাত্র হইতে যে পলস্তর খসিয়া পড়িয়াছিল তাহাতে অনবদ্য চিত্রাঙ্কনের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া বোধিসত্ত্ব অথবা গন্ধর্বগণ সেখানে লুটাইতেছিল। আর একটা বৌদ্ধ বিহার গাত্র অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি দ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়াছে। নানা ভঙ্গীতে বুদ্ধদেব চিত্রিত হইয়াছেন—কোথাও তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা, কোথাও উপবাসক্লিন্ন আর কোথাও বা অনুচরগণ কর্ত্তৃক পূজিত। ভূর্জ্জবৃক্ষের বল্কলের উপর লিখিত বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষার বহু ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুথি খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীর সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পুথির প্রচ্ছদ পট রূপে ব্যবহৃত কাষ্ঠ-ফলকগুলিও ব্রাহ্মী অক্ষরের দৌরাত্ম্য এড়াইতে পারে নাই।

তাহার পর 'নিয়া' দৃশ্যের কথা বলিব। এই স্থলে গ্রীক-বৌদ্ধ অর্থাৎ গন্ধার style এর সুন্দর কারুকার্য্য কাঠের চেয়ারের টুকরা, তাঁত বুনিবার উপযোগী যন্ত্রপাতি, বুট তৈয়ারী করিবার লাশ, এবং একটা ইঁদুর ধরিবার কল, বহুকাল বিস্মৃত কোন এক প্রাচীন যুগের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর নীরব পরিচয় দিতেছে। খরোষ্টি অক্ষরে লিখিত কাষ্ঠখণ্ড, চিঠি-পত্র, হিসাব, চিঠির খসড়া 'মেমো'

প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ দূর অতীতের দৈনিক গার্হস্থ্য জীবনের এক পৃষ্ঠা চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে। নিকটেই একটি জায়গা খুঁজিতে একটি ঘরে অসংখ্য "সরকারী" কাগজ-পত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটী দু-খানি কাষ্ঠ ফলকে দৃঢ় রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ ও গ্রন্থিস্থলের উপরভাগ Pallas Promachos, সিংহ-চর্ম্ম পরিহিত দণ্ডধারী Hercules অথবা Zeus মূর্ত্তির মৃন্ময় "শীল" দ্বারা চিহ্নিত। সেগুলি দলিল অথবা আবশ্যকীয় সরকারী কাগজ। শীল না ভাঙ্গিয়া বা রজ্জু না ছিন্ন করিয়া অভ্যন্তরস্থ পত্রের বিষয় অবগত হওয়া অসম্ভব। যাহাতে প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ উহার বিষয় অবগত হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। ষ্টাইন সাহেব এবম্বিধ দু-খানি চিঠি খুলিয়া দেখিলেন যে—"দেবতা ও মানবের চক্ষে সৌম্য দর্শন" মাননীয় শ্রীযুক্ত কোজভো সোজাকার নামে ঐ পত্র দুইটি লিখিত। অধ্যাপক র‍্যাপসন এই কাষ্ঠফলকাচ্ছাদিত খরোষ্টী অক্ষরে লিখিত কতকগুলি পত্র পরীক্ষা করিয়া, সেগুলি যে সরকারী কাগজ ছিল তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। পত্রের প্রথমেই লেখা আছে—"মহানুভব মহারাজা লিহতি" অর্থাৎ মহানুভব মহারাজা লিখতি—"মহারাজা আদেশ করিতেছেন।" খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে যে এই প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য ভারতের ভাষা ও বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, কি করিয়া এমনটি সম্ভবপর হইল? তাহার উত্তরে উয়ান-চুয়াং (হোয়েন সাঙ) বলিয়াছেন যে ভারতের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত পালি-জাতক ও অন্যান্য বহুগ্রন্থে উল্লিখিত বিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলার কল্যাণে সেই ভূমিভাগ বিদ্যা ও জ্ঞানের ছটায় বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে এইস্থান হইতেই এক উপনিবেশ খোটানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তক্ষশিলা সম্ভূত হইয়া উঠে। এই প্রশ্নের সমাধান আরও এক উপায়ে হইতে পারে। ভারতের ভাষা এবং বর্ণ—প্রাকৃতভাষা এবং ব্রাহ্মী ও খরোষ্টী অক্ষর—ভারতীয় শকরাজগণ চীনদেশের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত লপনর দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

মিরণে বালুকা-সমাধি-মগ্ন বহু স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথাকার চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ও পৌত্তলিকশিল্পে গ্রীক বৌদ্ধ অথবা গন্ধার Style এর প্রভাব বর্ত্তমান। আসনে উপবিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তির ছড়াছড়ি। কোথাও বুদ্ধদেব "ধ্যানমুদ্রায়" উপবিষ্ট, কোথাও বা অভয় মুদ্রায় দণ্ডায়মান অবস্থায় অঙ্কিত। এবম্বিধ একটী মূর্তির পাদদেশে সংস্কৃত ভাষায় ও "গুপ্ত ব্রাহ্মী" অক্ষরে লিখিত পুথি পরীক্ষা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহা বৌদ্ধ অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ,—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতেই লিখিত হইয়াছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে দেওয়ালের গায়ে অতি মনোরম বিবিধ মূর্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়—কোথাও গন্ধর্বগণ উড্ডীয়মান, কোথাও বুদ্ধদেব ধর্ম্ম বিষয়ে অববাদ করিতেছেন,

আর রাজা সমাহিত পুটাঞ্জলি হইয়া তাহাই শ্রবণ করিতেছেন, কোথাও বুদ্ধদেব অভয় মুদ্রায় অঙ্কিত, চতুষ্পার্শ্বে অর্হৎগণ তাঁহার বন্দনা করিতেছেন, আর কোথাও জাতকবর্ণিত রাজপুত্র বেস্সান্তর কমণ্ডলু হস্তে দণ্ডায়মান, তাঁহার প্রিয় হস্তী চারিজন ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন।

তারপর টুন-হুয়াঙ। এখানকার লোক সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল কিন্তু এই বৌদ্ধ ধর্মের একটুকু বিশেষত্ব আছে। চীনদেশের লৌকিক ধর্ম্মের সহিত ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের যে সংমিশ্রন হইয়াছিল সেই অদ্ভূত যৌগিক ধর্মই উহাদের ধর্ম।

এই স্থানে আসিয়া ষ্টাইন সাহেব "সহস্র বুদ্ধের" গুহা মন্দিরে নিহিত অপূর্ব রত্নের সন্ধান পান। তাঁহার অভিযানের দুই বৎসর পূর্বে এখানে একজন 'তাও' ধর্মাবলম্বী ভিক্ষু একটী জীর্ণ পুরাতন মন্দির সংস্কার করিতে করিতে এই গুপ্ত রত্ন আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার পর যক্ষের মত সেই ধন আগলাইয়া বসিয়াছিল। কত যত্নে, কত কৌশলে, কত 'ডিপ্লোমাসি'র সাহায্যে যে সেই রত্নের পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়।

যখন ষ্টাইন সাহেব সেই 'তাও' ভিক্ষুকে তাহার নবসংস্কৃত মন্দির দেখাইতে বলিলেন, তখন তাহার আর উৎসাহের সীমা রহিল না। মন্দিরের ভিতরটি সুদৃঢ় কাষ্ঠাবরণে মণ্ডিত এবং সমস্তটা চিত্রিত। মন্দিরের ভিতর দক্ষিণ দিকে পলাস্তর-বিহীন ইষ্টক নির্মিত আচ্ছাদনের পশ্চাতে একটী গুপ্ত গুম্ফা। সেই অন্ধকার গৃহ পঞ্জরে বহু শতাব্দের ক্ষয় ও ধ্বংস উপেক্ষা করিয়া অমূল্য গ্রন্থরাজি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় ৪৬ বর্গ-ফিট পরিমিত মন্দিরের মধ্যে একটা উচ্চ বেদীর উপর কতকগুলি নূতন মৃন্ময় মূর্তি আছে। সে গুলির সৌন্দর্য্য ত নাই, বরং তাহাদিগকে কুরূপ, কদাকার বলা চলে। বেদীর মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার শিষ্যগণ, অর্হৎবৃন্দ ও দিক্পালগণ দাঁড়াইয়া আছেন। ভাস্কর্য্যের অবনতি এই মূর্তিগুলি দ্বারা যতই সূচিত হউক না কেন, সেই নিঃস্ব, নির্ধন, ধর্মগত প্রাণ, তাও-ভিক্ষু যে তাহার সুদূর জন্মভূমি শান-শি প্রদেশ হইতে আসিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া সমস্ত ধন মন্দিরসংস্কারে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে, তাহার আকুল ধর্মপ্রাণতার কথা স্মরণ করিলে, ভাস্কর্য্যের নিকৃষ্টতা ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে!

ষ্টাইন সাহেবকে সেই পুঁথিগুলি উদ্ধার করিতে অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তিনিও যে বৌদ্ধধর্মের গৌরব-বর্দ্ধনের প্রয়াসী তাহাই প্রথমতঃ ভিক্ষুকে বুঝাইলেন। পরিব্রাজক শ্রেষ্ঠ মান-চুয়াঙ্ (হোয়েন্থ্-সাঙ) এর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির কথা তিনি নানা প্রকারে জানাইলেন। বলিলেন, সেই পরিব্রাজক প্রবরেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি ভারত হইতে দশ হাজার

'লি' নামক দুর্গম গিরি কন্দরের ভিতর দিয়া, শুষ্ক ভীতিময় মরুবালুকা রাশির উপর দিয়া, শত কষ্ট শত বাধা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারই এক কালের আশ্রয় স্বরূপ এই দুরধিগম্য মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মন্দিরাভ্যন্তরে বহু চিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে একটি মাত্র তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হোয়েনৎসাঙ যে খরস্রোতা নদীর উপকূলে দণ্ডায়মান, পার্শ্বে সম্ভোগ তাঁহার প্রিয় অশ্বটি হস্তলিখিত ধর্মপুস্তকের পুণ্য ভার বহন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় তাকে নদীর অপর পারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সেই ক্ষুদ্র ঊর্মিমালার উপর দিয়া একটা সুবৃহৎ কচ্ছপকে হেঁটে আসিতে দেখা গেল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্টেন সাহেব তাও-ভিক্ষুককে বুঝাইলেন যে, বৌদ্ধদেব প্রসূতি ভারত হইতে এ সব পুথি আসিয়াছিল। যদি ভিক্ষু সাহেবকে ভারতের জিনিষ ভারতেই ফিরাইয়া লইয়া যাইতে দেয়, তাহা হইলে বুদ্ধদেবের এবং ধর্মগ্রন্থগুলির প্রকৃত মর্যাদা রক্ষিত হইবে। এবং সেও অক্ষয় পারমার্থিক পুণ্য সঞ্চয় করিবে। এখানে থাকিয়া তো পুথিগুলি কেবলমাত্র নষ্ট হইতেছে, উহার মর্মোদ্ঘাটন করিবার লোক এখানে কোথায়? প্রতীচ্যে যে অদ্ভূত বিদ্যামন্দির (British Museum) আছে সেখানে উহার সংরক্ষণ হইবে, এবং বহু বিদ্বান্ মনীষিগণ তাহা হইতে কত নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন এই প্রকার স্তুতি ও আশ্বাস বাক্যের দ্বারা এবং মন্দিরটির জন্য প্রভূত ধনসাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়া ষ্টাইন্ সাহেব আবশ্যকীয় পুথিগুলি সেখান হইতে লইয়া আসেন।

সেই তমোময় কূপ হইতে যে বাণ্ডিলগুলি প্রথম বাহির করা হইল, তাহা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ সমূহের চীন ভাষায় অনুবাদ। কোনওটী কিঞ্চিন্মাত্রও নষ্ট হয় নাই। কাগজ ও আনুষঙ্গিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাহা যে বহু পুরাতন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না। আরও বেশ বুঝা যায় যে, সেগুলি রীতিমত পঠিত হইয়াছিল। চীন ভাষায় লিখিত এই গুটানো (Rolled) কাগজগুলির সঙ্গে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত আরও অনেক গুটানো কাগজ পাওয়া গেল। সেগুলি যে তিব্বতের প্রসিদ্ধ "তাঞ্জুর" ও "কাঞ্জুর" নামক ধর্মপুস্তক তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই চীনা কাগজগুলির উল্টা পিঠে ভারতীয় ব্রাহ্মী অক্ষরে (Indian Brahmi Script) লিখিত পংক্তি মাঝে মাঝে দেখা যায়। কোনও তর্ক ও বিসম্বাদের অপেক্ষা না রাখিয়া নিঃসঙ্কোচ-ভাবে বলা যায় যে, যে দূর অতীতে মধ্য এশিয়াতে বৌদ্ধধর্মের চর্চায় সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত ধর্মগ্রন্থের অনুশীলন হইত, এইগুলি সেই কালেরই পুস্তক। তারিম অববাহিকায় স্থিত মঠগুলি বৌদ্ধপণ্ডিতদিগের বিদ্যাচর্চার প্রকৃষ্ট নিকেতন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কাগজগুলি কোন্ সময়ের তাহাও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। উহারই সঙ্গে

মিশানো সরকারী কাগজপত্রে এবং কতকগুলি ধর্মপুস্তকের ভিতর তারিখের উল্লেখ আছে। ৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে "ব্লক" মুদ্রাঙ্কনের প্রচলন ছিল। কতকগুলি পুস্তক উড্ এন্‌গ্রেভিং-এ ছাপাও হইয়াছিল দেখা যায়।

স্থূল আস্তরণে আবৃত কতকগুলি চিত্র ষ্টাইন সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন। অতি সূক্ষ্ম গজ্ (Gauge) সিল্ক ও লিনেনের উপর চিত্রগুলি লিখিত। সেইগুলি যে মন্দিরচূড়ালগ্ন ধ্বজা ছিল তাহা তাহাদের ত্রিকোণাকৃতি ও বেণু-পেশিকায় আবদ্ধ রজ্জু দেখিয়া বুঝা যায়। যে পতাকাগুলি গুটানো ছিল, সেগুলি বিছান হইলে, অতি নিপুণভাবে চিত্রিত, ভারতীয় কলা-বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের অথবা অন্য কোনও বৌদ্ধ বিষয়ের চিত্র দেখা গেল। সেই চিত্রপটগুলি এত সূক্ষ্ম রেশম দিয়া নির্মিত যে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মধ্য এশিয়ার ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। উহারই মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা প্রায় সত্তরখানি তালপাত্রের উপর লিখিত একখানি সংস্কৃত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অক্ষরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু বড় সুন্দর; আক্ষরিক বিশিষ্টতা দেখিয়া, উহা যে খৃষ্টীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। কোন্ পরিব্রাজকের দ্বারা এই দূর মঠে এগুলি নীত হইয়াছিল কে জানে!

আর একটা সুবৃহৎ পুথি গুটানো অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহা "গুপ্ত" অক্ষরে লিখিত। বহির্ভাগে বিকশিত কমলদলের উপর দুইটী সুচিত্রিত মরাল অঙ্কিত। অপভ্রংশ উদীচ্য বৌদ্ধ সংস্কৃতের কতকগুলি বন্দনার সহিত কোন এক "অজ্ঞাত" ভাষায় লিখিত অনেকগুলি পংক্তি রহিয়াছে। আচার্য্য হর্ণলি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই দুইখানি সুরক্ষিত পুস্তক সংস্কৃত 'বজ্রচ্ছেদিকা' ও অপরিমিতায়ু' নামক বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থদ্বয়ের আক্ষরিক অনুবাদ। এই পুস্তকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য এই যে, উহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, টুন হুয়াঙে যে সমস্ত মঠ ছিল, তাহাদের সহিত তিব্বত, চীন ও তারিম প্রদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া যে বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন সগদিয়ানা প্রদেশে (আধুনিক সামারকান্দ ও বোখারা) প্রবেশ করিয়া আরব বিজয়ের (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পূর্ব পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহা চীনগ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রাচীন প্রমাণ হইতে সূচিত হয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুলর সাহেব (F. W. K. Muller) ও অধ্যাপক গ্রুণ্‌ওয়েডেল্ (Grun-wedel) তুর্ফানে প্রাপ্ত পুথি হইতে স্থির করিয়াছেন যে বৌদ্ধ ও মণিকীয় ধর্মাবলম্বী সগদিয়ানগণ Chinese Turkestan উত্তর পর্য্যন্ত বসবাস করিয়াছিল

ও তথায় সদদিরার ভাষার অনুদিত (ও লিখিত) নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ ব্যবহার করিত। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব তুর্কীস্থানের উপর চীনের আধিপত্য ক্ষীণ হইয়া ক্রমে নির্বাপিত হয় এবং অর্ধ শতাব্দী পরে এই তারিম প্রদেশে তিব্বতের প্রভাবও লুপ্ত হয়। তখন হইতে উইগুর প্রভাবের বিস্তার আরম্ভ হয় এবং দুই শতাব্দী ধরিয়া এই তুর্ফানই উইগুর প্রভাবের পীঠস্থান থাকে। তুর্কী ও মধ্য পারসিক (Middle Persian) ভাষায় লিখিত যে সব পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অধ্যাপক মুলের স্থির করিয়াছেন যে বুদ্ধের ও মণির ধর্ম পাশাপাশি নির্বিরোধে অবস্থিত ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সমূহ যে পুরাতন তুর্কী ভাষায় অনূদিত ও উইগুর অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এইরূপ অনেকগুলি পুথিই সুসংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক Denison Ross ইহার মধ্যে দুইখানি গ্রন্থ চিনিতে পারিয়াছেন। 'অভি ধর্মকোষ' নামক অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিবয়ক বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থের ভাষা ঐ দুইখানি পুথির মধ্যে আছে। চীন পরিব্রাজক উয়ান্ চুয়াং উক্ত ধর্মগ্রন্থখানিকে মূল সংস্কৃত হইতে ভাষান্তরিত করেন। পরে উহার ভাষ্য লিখিত হইয়াছিল।

[মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫]

মধ্যযুগে সারনাথ

বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য

মধ্যযুগের সারনাথ বিহার ও সারনাথ পরিব্রাজক তাই সং:—মহারাজ হর্ষবর্ধনের দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই ভারত-সাম্রাজ্যে ঘোর দুর্দশার সূত্রপাত হয়। কেন্দ্রশক্তির অভাবে উত্তর-ভারতে নানা বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। প্রায় তিন শতাব্দী (৬৫০—৯৫০) ব্যাপিয়া এই অরাজকতার হ্রাস ভারত-ইতিহাসে লক্ষিত হয় না। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আমরা কতিপয় সুদৃঢ় রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর মুসলমান আক্রমণে প্রায় সকল হিন্দু-রাজ্যেরই অন্তিমদশা উপস্থিত হয়। এই ষষ্ঠ শতাব্দী ব্যাপী ভারতেতিহাসের মধ্যযুগে ভারতের বহির্দেশ হইতে কোনও অহিন্দু আক্রমণকারী আর্য্যাবর্তকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য আগমন করে নাই। সুতরাং এই সময়ে হিন্দু-ধর্মের নানা সংস্কার লাভের অবসর ঘটিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বিবিধ সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এ যুগের দেবমূর্ত্তিগুলি কোন্‌টী হিন্দুর, কোন্‌টী বৌদ্ধের ইহা নিশ্চিতরূপে স্থির করা অনেক স্থলে অসম্ভব হইয়া উঠে। এই বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বৌদ্ধকেন্দ্র সারনাথে বহুবার লক্ষ্য করা গিয়াছে। সুতরাং মধ্যযুগে উত্তরভারতে হিন্দুরাজার আধিপত্য থাকিলেও সারনাথবিহারের ধর্ম ও শিল্পের সংস্থিতির কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই যুগে আমরা সারনাথে বহু চৈত্য নির্মাণের কথা, বৈদেশিক ভ্রমণকারীর আগমনের কথা, স্থবিরগণের ধর্মচর্চার কথা, বিহারের বিবিধ সংস্কারের কথা, শিল্প-নিদর্শন—লিপিমালা ও সমসাময়িক ইতিহাস হইতে অবগত হইতে পারি। প্রধানতঃ তিনটী দিক হইতে সারনাথ-বিহারের এই তথ্যানুসন্ধান করা যাইতে পারে—শিল্প, ধর্মসম্প্রদায় ও রাজার কর্তৃত্ব। আমরা ক্রমে ক্রমে এই যুগের সারনাথের ইতিহাস যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরভারতে কান্যকুব্জের রাজাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। বাক্‌পতি কবির "গউড়বহো" নামক কাব্য হইতে কান্য-কুব্জরাজ যশোবর্মার রাজ্যের সীমা স্থির করা যায়, তাহাতে বুঝা যায় বারাণসী ও বৌদ্ধ-বারাণসীও তাহার অন্তর্গত ছিল। (১) যশোবর্মা ৭৩১ সালে চীনদেশে

---

(১) Although confined to the Doab and Southern Oudh as far as Benares it (the kingdom of Kanauj) Still * *" Imp. Gaz Vol II. p. 310.

একজন দূত প্রেরণ করেন যদিও তিনি বৈদিকমার্গের পুনরুদ্ধারের জন্য অপরিসীম যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্নে বারাণসীধাম বেদচর্চার প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল (২) তথাপি সারনাথ-বিহারের উন্নতির কোন হানি হয় নাই। সারনাথের খ্যাতি শুনিয়া সুদূর চীন দেশ হইতে পরিব্রাজক তাই সং (Tai-tsong) ৭৬৪ সালে মহাবোধি-বিহার দর্শনান্তে বারাণসী (Podo-ni-sen) অথবা মৃগদাবের অন্তর্গত ঋষিপত্তনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে এই স্থানেই বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।(৩) এই চীন-পরিব্রাজকের পূর্বে 'ওয়াং-হুয়েং-সি' নামে অন্য একজন পরিব্রাজক ৬৫৭ সালে ভারতে পর্যটন করেন, কিন্তু তাঁহার লিখিত বিবরণে মৃগদাবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। (৪)

৯ম ও ১০ শতাব্দীতে সারনাথঃ যশোবর্মার মৃত্যুর পর যথাক্রমে বজ্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদের বৈদিক বা হিন্দুধর্মে সেরূপ আস্থা ছিল না। অতএব অনুমান হয়, তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের প্রতিই অধিক অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত বারাণসীর অন্তর্গত সারনাথ-বিহারে নানা উন্নতির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে ইন্দ্রায়ুধ পালনৃপতি ধর্মপাল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েন। বৌদ্ধ নৃপতি ধর্মপাল তৎপর চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জরাজ্যের অধীশ্বর করেন। কিন্তু চক্রায়ুধের রাজ্যকাল স্থায়ী হয় নাই। ৮১০ সালে গুর্জ্জর প্রতিহাররাজ নাগভট তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কান্যকুব্জে স্বকীয় বংশের রাজপদের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের তৃতীয় নৃপতি মহাপরাক্রমশালী মিহিরভোজ অথবা প্রথম ভোজদেব চিত্রকূট গিরি-দুর্গ হইতে অগ্রসর হইয়া প্রায় ৮৪০ খৃঃ কান্যকুব্জ জয় করেন। (৫) "আদি বরাহ" উপাধিধারী এই ভোজের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। (৬) সুতরাং ইহা স্থির যে সারনাথ বৌদ্ধবিহারও কিছুদিনের

(২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের কাশীপরিক্রমা, ২৪৬ পৃঃ।

(৩) Journal Asiatique, 1895 Vol II. p. 357-366. সারনাথ সম্বন্ধে কোনও লেখায় এ পর্য্যন্ত কেহই এই উল্লেখটি লক্ষ্য করেন নাই।

(৪) Levi's article "Les Missions de Wang. Hiuentse dans" Inde. I. A. 1900.

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে (রাজন্যকাণ্ড) ১৬২ পৃঃ।

(৬) V. A. Smith's Early History of India (2nd Edition) p. 350.

জন্য তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। (৭) কিন্তু কদাপি বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। কারণ, তাঁহারই রাজত্বে দেবপালের ভ্রাতা এবং প্রথম বিগ্রহপালের পিতা মহাযোদ্ধা জয়পাল সারনাথে দশটি চৈত্য নির্মাণ করাইছিলেন। সারনাথে প্রাপ্ত তাঁহার লিপি হইতে এ কথা জ্ঞাত হওয়া যায়। (৮) বাক্পালের পুত্র এই জয়পাল দেবপালের শত্রুদলনে ও স্বরাজ্য-বিস্তারে প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। তিনি প্রাক্জ্যোতিষপুর ও উৎকলের নৃপতিদ্বয়কে দমন করেন। (৯) আবার এই জয়পালই ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশকার নারায়ণভট্ট কর্তৃক উত্তররাঢ়ের অধিপতি রূপে পরিচিত হইয়াছেন। (১০) তিনি মহাপণ্ডিত উমাপতিকে পিতৃশ্রাদ্ধে মহাদান করিয়াছিলেন একদিকে হিন্দুর কর্তব্য পিতৃশ্রাদ্ধ, অন্যদিকে বৌদ্ধবিহারে চৈত্য দান। পূর্বেই বলিয়াছি এ যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে আচারগত নানা সমন্বয়ের অভাব ছিল না। ইতিহাসে জয়পালের সময় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ। তাঁহার সারনাথের লিপির অক্ষরও এ কথার পোষকতা করে। লিপিতে সকল লোককে "সর্বজ্ঞ" বা বুদ্ধ হইতে কামনা করা হইয়াছে; ইহা হইতে তাঁহার বৌদ্ধধর্মের প্রতি তথা সারনাথের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা সূচিত হইতেছে। প্রায় ৮৯০ খৃঃ ভোজের মৃত্যুর অব্যবহিতপরেই গৌড়ের বিগ্রহপাল অল্প সময়ের জন্য কান্যকুব্জ প্রদেশ অধিকার করিয়া আপন নামে মুদ্রার প্রচলন করেন। (১১) অতএব দেখা যাইতেছে খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রায়ই উত্তরভারতে গুর্জর-পালদ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। সুতরাং বারাণসী এবং সারনাথবিহার একবার পালরাজের, একবার কান্যকুব্জাধীশের অধিকারে আসিতেছিল। অবশ্য

(৭) ভোজদেব গুর্জর-প্রতিহার বংশোদ্ভব বলিয়া কেহ কেহ হয়ত অনার্য্যসম্ভূত বলিবেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের গুরু কবি রাজশেখর মহেন্দ্রপালকে রঘুকুল চূড়ামণি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কবিকে এ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলিবার সন্তোষজনক কারণ পাই না।

"ভাব কহিন্দজন্দু এদং কো ভণই রঅনি বল্লহ সিহণ্ডো।
র হু উ ল চূ ড়া ম ণি নো মহেন্দ্রপালসস্ কো অ শুরু॥
কর্পূরমঞ্জরী প্রস্তাবনা।

(৮) Sarnath Museum Catalogue No D (f) 54, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭-৫৮; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কৃত গৌড়রাজমালা, ২৯ পৃঃ।

(১০) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালীর ইতিহাস পৃঃ ১৮৫।

(১১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) ১৬৫ পৃঃ।

অধিককালের জন্য কান্যকুব্জরাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ভোজদেবের পর তাঁহার পুত্র পরাক্রমশালী মহেন্দ্রপাল কান্যকুব্জের সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন। গয়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা সৎকার্য্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (১২) তিনি বাহুবলে বহুদূরে পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, পঞ্চনদ ব্যতীত পশ্চিম সমুদ্র হইতে মগধ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরভারত তাঁহার করতলগত ছিল। তাঁহার প্রদত্ত কয়েকখানি লিপি এবং তাঁহার গুরু রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী হইতে এই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। (১৩) অতএব সারনাথও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন কান্যকুব্জরাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, অন্যদিকে আবার তেমনি দেবপালের মৃত্যুতে গৌড়রাজ্যগৌরব অস্তাচলগামী হইয়া পড়ে। "এই দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা হইতেই, উত্তরাপথের অধঃপতনের সূত্রপাত। মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক উত্তরাপথ বিজিত হইবার তখনও প্রায় তিনশত বৎসর বাকী ছিল। কিন্তু উত্তরাপথের এই তিন শত বৎসরের ইতিহাস তুরুষ্ক বিজেতার সাদর অভ্যর্থনার উদ্যোগের সুদীর্ঘ কাহিনী মাত্র।" (১৪) মহেন্দ্রপালের পর দশম শতাব্দী ব্যাপিয়া কনৌজের সিংহাসনে পর পর দ্বিতীয় ভোজ, মহীপাল, দেবপাল ও বিজয়পাল প্রভৃতি নরপতিগণ আরোহণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের রাজ্যকালে রাষ্ট্রকূট-প্রভাব বিস্তারে ও চন্দেলবংশীয় জেজাভুক্তির রাজগণের অভ্যুদয়ে কান্যকুব্জরাজ্য ক্রমশঃই হতশ্রী হইয়া সংকুচিত হইতেছিল। অল্পকালের জন্য দুই একবার কান্যকুব্জ রাষ্ট্রকূটগণ কর্তৃক অধিকৃতও হইয়াছিল। এদিকে আবার গৌড়রাজ্যেরও এই একই দশা। দেবপালের পর পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রকূট কাম্বোজগণের আক্রমণে গৌড়রাজ্য অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। সারনাথবিহার এতদিন কান্যকুব্জরাজ্যাধিকারে থাকিলেও তান্ত্রিক বৌদ্ধমতাবলম্বী পালনৃপতিগণের বিবিধ সাহায্য ও আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু দশম শতাব্দীতে এই উভয় রাজ্যের হীন দশায় সারনাথেরও অধঃপতনের সূচনা হইয়াছিল। বৌদ্ধসমাজের বিহারের প্রতি, গন্ধকুটীর প্রতি অবহেলায় বিহারের শিল্পসামগ্রীর জীর্ণতা একাদশ শতাব্দীতে পালরাজ মহীপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই নানাবিধ সংস্কার কার্য্যের প্রয়োজন

---

(১২) বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ২০১ পৃঃ।

(১৩) 'বৈতালিকঃ—জয় পূর্ব্বদিগঙ্গনা ভুজঙ্গ চম্পাচম্পকর্ণপূর লীলানির্জ্জিত রাঢাদেশ বিক্রমাক্রান্ত কামরূপ হরিকেলী কেলিকারক অপমানিত জাত্য সুবর্ণ বর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরত্ব রমণীয়, ন্যায় তে ভবতু সুরভি সমারম্ভঃ। (সংস্কৃতানুবাদ) কর্পূরমঞ্জুরী ১ম জবনিকান্তর।

(১৪) গৌড়রাজমালা, ৩২ পৃঃ।

অনুভূত হয়। দশম শতাব্দীতে নহে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তৎপূর্ব হইতেই, বৌদ্ধ সমাজে তান্ত্রিকতার নানা দোষ স্পর্শ হওয়ায় সারনাথ বিহারের অবনতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। আমরা এস্থলে তান্ত্রিকতার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ধর্মচক্রবিহারে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব: সকলেই জানেন বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায় চলিয়াছে—একটী হীন যান আর একটী মহাযান। হীনাযান পূর্ববর্তী, মহাযান পরবর্তী। সাধারণতঃ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মত, মহাযান-মত নাগার্জ্জুনের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু নানা প্রমাণ দেখিয়া মনে হয়, মহাযানমত আরও পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। (১৫) বৈশালীর বৌদ্ধ সংগীতিতে দুই দলের সৃষ্টি হয়—স্থবিরবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক। এই মহাসাঙ্ঘিকগণই কালক্রমে মহাযান হইয়া পড়েন: নেপালীয়গণের দেবভাজু ও গুভাজু ধর্ম দেখিয়াও মহাযানীদিগের প্রকৃতি বুঝা যায়। (১৬) সারনাথবিহার বৌদ্ধধর্মের আদিভূমি, সুতরাং হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়েরই নমস্য ক্ষেত্র। তাই আমরা কণিস্কর পর হইতে হর্ষবর্দ্ধনের সময় পর্য্যন্ত হীনযানীয় সম্মিতীয় ও সর্বাস্তিবাদিগণ এবং মহাযানীয়গণের সারনাথে নির্বিরোধে বাসের নানা পরিচয় পাইয়া থাকি। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের আরম্ভ, সঙ্গে সঙ্গে মহাযান সম্প্রদায়ে তান্ত্রিককতারও প্রবেশ লাভ। (১৭) হিন্দুগণের তান্ত্রিকতা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধগণ সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। বরং তাহাতে বৌদ্ধগণের "হিতে বিপরীত হইল।" তান্ত্রিক মন্ত্রতন্ত্রের অপব্যবহার করিয়া মহাযানীগণ নৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বহিরঙ্গের উপাসনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ যোগিগণের আর সে পূর্বের চরিত্রের শুদ্ধতা, মনের নির্মলতা ছিল না। তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে ভেল্কির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। তাই আমরা মহারাজ হর্ষের সময়ে লিখিত নাগানন্দে, যশোবর্মার সময়ে লিখিত মালতীমাধবে এবং মহেন্দ্রপালের সময়ে লিখিত কর্পূরমঞ্জরীতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার, ভৈরব-ভৈরবীর ভীষণতার বিবরণ দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহাযানীয়দিগের যোগাচার সম্প্রদায় ক্রমশঃ মন্ত্রযানে পরিণত হইতেছিল। (১৮) নবম শতাব্দীতে মন্ত্রযানমত বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে সর্বজনগৃহীত হইয়াছিল।

(১৫) অশ্বঘোষের গ্রন্থাবলী, লঙ্কাবতার প্রভৃতি এই মতে পূর্ণ।

(১৬) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই মহোদয়ের "বৌদ্ধধর্ম" প্রবন্ধ, নারায়ণ, শ্রাবণ, ১৩২২ এবং N. N. Vasu's Modern Buddhism, Introduction p. 24.

(১৭) H Kern's Manual of Buddhism, p 133

(১৮) Modern Buddhism. pp. 3, 4.

'আদি কর্মরচণ' প্রভৃতি এই মতের পুস্তকও এই সময়ে রচিত হয়। দশম শতাব্দীতে মন্ত্রযানের অন্তর্গত কালচক্রযান (১৯) হইতে বজ্রযান (২০) নামে একটী ভীষণ মত জন্মলাভ করে। এই মতবাদ নেপালে ও তিব্বতেই অধিকভাবে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। (২১) মহাযানীয় সকল শাখার মধ্যেই নানা দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল তাঁহারা হিন্দুগণের নিকট হইতে যেরূপ তান্ত্রিকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুতন্ত্রোক্ত দেবদেবীর পূজার আদর্শও লইয়াছিলেন। তারা, চামুণ্ডা, বারাহী প্রভৃতি দেবীগণ হিন্দুর পুরাণে তন্ত্রে বহুদিন হইতেই পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। মন্ত্রযান ও বজ্রযান সম্প্রদায় এইগুলি সম্ভবতঃ গ্রহণ করিয়া অনেক স্থলে নামের ও আকারের পরিবর্তন করিয়াছিলেন। যথা, জঙ্গলীতারা, বজ্রবারাহী, বজ্রতারা মারীচী প্রভৃতি ভীষণাদেবী তাঁহাদের অভিনব সৃষ্টি। (২২) আবার ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, হিন্দুগণ পুনরায় ইঁহাদের নিকট হইতে অনেক দেবদেবীর মূর্তি ধার করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রী, অক্ষোভ্য অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি মূর্তি মহাযানীয়গণের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং এর সকল মূর্তির পূজা কুষাণ ও গুপ্তযুগেও বর্তমান ছিল। পরবর্তিকালের হিন্দুগণ বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীকে মঞ্জুঘোষ, বৌদ্ধ অক্ষোভ্যকে শিব বা ঋষি বত্তাল'কে বার্তালীরূপে নীরবে গ্রহণ করিয়াছেন। (২) বৌদ্ধ-তান্ত্রিক প্রভাব ভারতের নানা বৌদ্ধস্থানে ব্যপ্ত হইয়াছিল, সারনাথে আমরা বহু বৌদ্ধশক্তিমূর্তি দেখিতে পাই। যথা তারা নং B (*f*)₂, B (*f*) 7, বজ্রতারা নং B (*f*)*, মারীচী নং B (*f*)² 3। এই সকল মূর্তি নিশ্চয়ই পালরাজগণের

---

(১৯) কালচক্রযান অর্থে ধ্বংস হইতে পরিত্রাণ পাইবার গতি বুঝায়। গুয়াডেল সাহেব এই যানকে ভূত-পিশাচবিদ্যা (Demonology) বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতই ইহা তাই। ইহাতে বুদ্ধকে পর্যন্ত পিশাচরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। নেপালের বৌদ্ধধর্ম সাধারণতঃ এই যানের অন্তর্গত।

(২০) এই পথের উপাসনা মধ্যবিত্ত ও বিবাহিত বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কামলোক হইতে রূপলোক যাইতে হইবে। আরও অগ্রসর হইতে হইবে, তবে অরূপলোক। তথায় নিরাত্মাদেবীর সহিত মিশিলেই নির্বাণ হইবে।

(২১) Grunwedel's "Mythologie des Buddhismus. pp. 51, 94, 100 101.

(২২) Taratantra (V R. S.) Introduction by Pandit Akhoy Kumar Maitra B. L, p. 11, 21.

(২৩) Introduction to Modern Buddhism by M. M. Haraprashad Sastri C. I. E. P. 12 and N N. Vasu's "Archaeological Survey of Mayurvanja Vol II. Introduction P, XCV. Taratantra Intro. p II.

প্রভাবে নবম ও দশম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। পালনৃপতিগণ সম্ভবতঃ মন্ত্র-বজ্রযানের উপাসক ছিলেন, তাঁহাদিগের মন্ত্রযানের কেন্দ্র বিক্রম শিলাবিহার নির্মাণ এবং তারানাথের উক্তি হইতে একথা সপ্রমাণ করা যায়। (২৪) অতএব ধর্মচক্রবিহারে নবম ও দশম শতাব্দীতে মন্ত্রযান-বজ্রযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বিরাজিত ছিলেন ইহা একরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত। পালরাজগণ একদিকে নানাস্থানে শিবপ্রতিষ্ঠা করিতেন, অন্যদিকে বৌদ্ধভাবে শিবশক্তির ও উপাসনা করিতেন। এই উভয় বিষয়েরই নিদর্শন সারনাথে আছে।

একাদশ শতাব্দীতে সারনাথের পরিচয়ঃ দশম শতাব্দীর অন্তভাগে কান্যকুব্জরাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আবার তাহার উপর সবুক্তিগীন, সোলতান মামুদ প্রভৃতি মুসলমানগণ এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত উত্তরভারতে উপর্য্যুপরি যে অত্যাচারপূর্ণ আক্রমণের অভিনয় করিতেছিল তাহাতেও কান্যকুব্জ-রাজ্যের দুর্দশার অবধি ছিল না। ১০১৮ সালে মামুদের কনৌজ আক্রমণে নৃপতি রাজ্যপাল পলায়ন করিয়াও অব্যাহতি পান নাই। সুতরাং এ সময়ে সারনাথবিহারের অধোগতির বিষয় কল্পনাতীত। কনৌজ অধিকারের পর মামুদ কতেহর (রোহিলখণ্ড) জয় করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি বারাণসীর ও সারনাথের মন্দিরাদিও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। (২৫) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বারাণসী তখন গৌড়রাজ্যভুক্ত এবং গৌড়সেনা-রক্ষিত ছিল এবং সম্ভবতঃ বারাণসী তীর্থ মামুদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। (২৬) এই মতটী আরও দুইটী কারণে আমাদের সঙ্গত বলিয়া

---

(২৪) "He (Taranath) adds that during the reign of the Pala dynasty there were many masters of magic, Mantra Vajracaryas, who, beign Possessed of Various Siddhis, performed the most prodigious feats." Kern's Manual of Buddhism p 135. Taranath 201 (quoted)

(২৫) "This much however, is certain, that in A. D. 1026 a restoration of the main monuments of Sarnath took place, and we may perhaps connect this restoration with the capture of Benares by Mahmud of Ghazni which occured in A. D. 1017"—Sarnath Catalogue. Vogel's Introduction, p. 7.

(২৬) গৌড়রাজমালা ৪১, ৪২ পৃঃ। ১০২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই মহীপাল বারাণসী রাজ্য জয় করেন. শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "The Palas of Bengal" by R D. Banerjee ; Memoirs of A S. B Vol. V, No 3, p. 70.

মনে হয়। প্রথমত পরধর্মদ্বেষী মামুদের আক্রমণ 'যেমন তেমন' হয় না, তিনি যে তীর্থস্থানেই আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা ধ্বংস করিয়া ছাড়িয়াছেন। তাঁহার বারাণসী সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাপারের পরিচয় কোন ইতিহাসে নাই। দ্বিতীয়তঃ "ঈশান চিত্র ঘণ্টাদি-কীর্তি রত্ন শতানি" নির্মাণ করাইতে মহীপালের বহু সময় লাগিয়াছিল এবং নিশ্চয়ই এগুলির নির্মাণ-সময় সারনাথের সংস্কার কার্যের সময়ের অথবা ১০২৬ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ববর্তী। মামুদের আক্রমণ সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে 'কীর্তিরত্নশতানি" নির্মাণ করা অসম্ভব ব্যাপার। নিয়াল্তিগীনের পূর্বে (১০৩৩) বারাণসী মুসলমানস্পর্শে আসে নাই, একথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন। (২৭)

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে নানা কারণে সারনাথ বিহার বহুদিন যাবৎ জীর্ণদশাপন্ন হইতেছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাল নরপাল মহীপালের অভ্যুদয়ে ম্রিয়মাণ বৌদ্ধসমাজ ক্ষণকালের জন্য নবজীবন লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সময়ে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিত হয়, বহু বৌদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতে এই সময়েই বৌদ্ধধর্মের লুপ্তগৌরব পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। মহীপালই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশকে বিক্রমশিলায় আহ্বান করিয়া প্রধান আচার্যপদে বরণ করেন। সুতরাং এই পাল নৃপতির সময়ে লুম্বিনীবন, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আদিস্থান সারনাথেরও যে জীর্ণোদ্ধার কার্য সাধিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? ১০২৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মহীপালদেবের সারনাথ-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীরামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া গৌড়াধিপ মহীপাল যাঁহাদের দ্বারা পূর্বে কাশীধামে ঈশান ও চিত্র ঘণ্টাদি (দুর্গার) শত শত কীর্তি-রত্ন নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই স্থিরপাল ও বসন্তপালের দ্বারা মৃগদাবে ১০৮৩ সম্বতে "ধর্মরাজিকা" বা অশোক স্তূপ "সাঙ্গ-ধর্মচক্রে"র (?) জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন; এবং অষ্ট মহাস্থান বা সমগ্র বিহারের শিলানির্মিত গন্ধকুটী (Main Shrine) নির্মাণ করাইয়াছিলেন। (২৮) এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই সময়কে সর্বদেশাবচ্ছিন্ন "সংস্কার যুগ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য সারনাথে এই মর্মের একখানি মহীপাল-লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সারনাথের সংস্কারের অব্যবহিত পরেই বারাণসী পালরাজগণের হস্তচ্যুত

---

(২৭) Tankhu-s Subuktigin, Elliot's History of India, Vol. II p. 123.

(২৮) গৌড়লেখমালা ১০৪-১০৯ পৃষ্ঠা বিশেষ আলোচনার দ্রষ্টব্য। Venis in J. A. S. B. ও দ্রষ্টব্য।

হইয়া চেদিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। (২৯) কিছুদিন পর্যন্ত বারাণসী ও সারনাথ চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেবের অধিকারে ছিল। গাঙ্গেয়দেবই নানা যুদ্ধ কার্যে ব্যাপৃত থাকায় বোধ হয় নববিজিত বারাণসী রাজ্যের সেরূপ সুরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাই, আমরা তাঁহার সময়ে গজনীর অধীশ্বর মাসুদের (Ma'sud) অধীন লাহোরের শাসন কর্তা নীয়ালতিগীন কর্তৃক কয়েক ঘণ্টার জন্য বারাণসী লুণ্ঠনের কথা শুনিতে পাই। (৩০) এই লুণ্ঠন ব্যাপার অতি সামান্য। বারাণসীতে তিনটী বাজার মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অধিকারেই ইহার পর্যাবসান হইয়াছিল। মুসলমানগণের এই আক্রমণ যে সারনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ১০৩০ সালে গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহাবীর কর্ণদেব সুবিস্তৃত পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হয়েন। একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, ১০৪২ খৃষ্টাব্দ বারাণসীরাজ্য তাঁহার রাজ্যসামভুক্ত ছিল। (৩১) সারনাথেও তাঁহার কর্তৃত্বসূচক একখানি লিপি [D (l) 8] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে তারিখ রহিয়াছে, কলচুরি সংবৎ ৮১০ অথবা ১০৫৮ খৃষ্টাব্দ। লিপি হইতে বুঝা যায়, সারনাথের তখনও নাম ছিল, "সদ্ধর্ম চক্রপ্রবর্তন" বিহার, মহাযানীয়গণ ইহাতে প্রবল ছিলেন, মহাযানীয় শাস্ত্র "অষ্টসাহস্রিকার" প্রতিলিপি এই সময় প্রস্তুত করান হইয়াছিল। তাঁহার পিতার সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে (৭৯৩) চেদি সংবতে প্রয়াগ হইতে কর্ণদেব যে তাম্রশাসন দান করেন, তাহাতে আছে যে তিনি কর্ণাবতী নামে নগরী এবং কাশীধামে কর্ণমেরু নামে একটি সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। (৩২) চেদিপতি কর্ণদেব প্রায় ৬

---

(২৯) R D. Banerji's The palas of Bengal (M. A. S. B) p. 74

(৩০) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উভয়েই নিঃসন্দেহে লিখিয়াছেন যে নীয়ালতিগীনের আক্রমণ সময়ে বারাণসীরাজ্য পালগণের অধিকৃত ছিল। এরূপ লিখিবার কারণ বুঝিতে পারি নাই। মুসলমান ইতিহাসে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে—"Unexpectedly he (Nialtigin) arrived at a city which is called Banaras and which belonged to the territory of Gang. Never had a Muhammadan army reached this" Elliot. Vol II. p 123 ইহা ছাড়া সারনাথে প্রাপ্ত কর্ণদেবের লিপিও বারাণসীতে চেদী অধিকারের পরিচয় প্রদান করে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও গাঙ্গেয়দেবের যে রাজ্যসীমা দিয়াছেন তাহাতে বারাণসীও অন্তর্ভুক্ত ছিল, মনে হয়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) ১৮৩ পৃঃ।

(৩১) Epi Ind. Vol II, p. 300.

(৩২) Ibid. ১৮৮ পৃঃ। Ibid, p. 305.

বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সারনাথ বিহার তাঁহারই কর্তৃত্বে ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

একাদশ শতাব্দীর প্রায় অন্তভাগে মহাবীর চন্দেল্ল নৃপতি কীর্তিবর্মা কর্ণদেবকে পরাভূত করিয়া তাঁহার বিস্তৃত কীর্তি ও রাজ্য নানাভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। (৩৩) সম্ভবতঃ এই সময়ে কিছুকালের জন্য সারনাথও তাঁহার করতলগামী হইয়াছিল। ইহার পরে আবার একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে কান্যকুব্জের নবপ্রতিষ্ঠিত গাহড়বালবংশের নৃপতি চন্দ্রদেব বারাণসী, অযোধ্যা প্রভৃতি উত্তরাপথের প্রধান রাজ্যগুলি বিজয় করিয়াছিলেন। (৩৪) এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বারাণসীর তথা সারনাথের শাসন কর্তৃত্ব গাহড়বালরাজগণের হস্তেই ছিল। তাঁহাদিগের দ্বারা বারাণসীর এবং সারনাথের বিবিধ উন্নতির পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। চন্দ্রদেবের পৌত্র এই বংশের রত্নচূড়ামণি গোবিন্দচন্দ্রের বারাণসী প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত অসংখ্য লিপি ও মুদ্রা হইতে তৎকর্তৃক কান্যকুব্জের প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। (৩৫) তাঁহার রাজ্যকাল সম্ভবতঃ ১১১৪-১১৫৪ খৃষ্টাব্দ। তিনি একবার মগধ আক্রমণ করিতে যাইয়া লক্ষ্মণসেনের সহিত সংঘর্ষের সৃষ্টি করেন। তাহার ফলে লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কিছু সময়ের জন্য প্রয়াগ পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে ও ত্রিবেণীসঙ্গমে যজ্ঞযূপসহ বহু সমরজয়স্তম্ভ স্থাপিত করেন। (৩৬) অবশ্য লক্ষ্মণসেনের এই বারাণসী অধিকার অল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোবিন্দচন্দ্রের অন্যতমা মহিষী কুমারদেবী সারনাথে ধর্মাশোককালীন একটি ধর্মচক্র জিন বা বুদ্ধমূর্তির সংস্কার উপলক্ষে অপূর্ব গৌড়ীরীতিতে নিবদ্ধ একখানি দীর্ঘ প্রশস্তি প্রদান করেন। এই প্রশস্তি হইতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক সংবাদ অবগত হওয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে, রাষ্ট্রকূটবংশীয় মহন-

---

(৩৩) V. A. Smith's Early History of India (2nd Ed.) p. 362; কাশী-পরিক্রমা, ২৪৭ পৃঃ; বাঙ্গলার ইতিহাস ২৩১, ২৩২ পৃঃ; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) ১৮৭ পৃঃ।

(৩৪) Early History of India (2nd Edn) p. 355—"Chandradeva, who established his authority certainly over the Delhi territory.

(৩৫) এই বংশের মুদ্রার কথা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'প্রাচীন মুদ্রা" প্রথম ভাগ ২১৭, ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩৬) রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৩১, R. D. Banerji's 'The Palas of Bengal' p. 106-107.

দুহিতা শঙ্করদেবীর সহিত পীঠিপতি দেবরক্ষিতের বিবাহ হয়। শঙ্করদেবীর গর্ভে কুমরদেবীর জন্ম। কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। (৩৭) রামপালচরিত অনুসারে মহন গৌড়াধিপ রামপালের সম্পর্কে মাতুল হইতেন। কৈবর্ত্ত বিদ্রোহকালে এই মহন, গৌড়াধিপের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। এই লিপিতে মহন কর্তৃক দেবরক্ষিতের পরাজয়ের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, কৈবর্ত বিদ্রোহকালে অথবা তাহার পূর্বে পীঠিপতি রামপালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবেন। (৩৮) গোবিন্দচন্দ্র হিন্দু হইলেও, কুমরদেবীর বৌদ্ধপ্রীতি সারনাথে বিহার-নির্ব্বাণ বুদ্ধমূর্তির সংস্কার ও "ধর্ম্মচক্রজিন শাসন-সন্নিবন্ধ" তাম্রশাসন দান প্রভৃতি কার্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রশস্তিতে আছে, দুষ্ট-তুরুস্কসেনা হইতে বারাণসীকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব গোবিন্দচন্দ্রকে প্রহরিরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। (৩৯) ইহা হইতে অনুমান হয় যে, নীয়াল্‌তিগীনের পরেও তুরুস্কগণ বিশ্রাম সুখ অনুভব না করিয়া বারাণসী প্রভৃতি স্থানের প্রতি ধাবিত হইতে বিরত হন নাই। গৌড়-রাজমালায় বহ রামশাহ প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারাণসী আক্রমণ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। (৪০) সুতরাং গোবিন্দচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বারাণসী ও সারনাথকে তুরুস্ক আক্রমণ হইতে অবশ্যই রক্ষা করিয়াছিলেন।

---

(৩৭) বল্লভরাজ (পীঠীর) মহন (রাষ্ট্রকুট) চন্দ্র (গহড়বালবংশীয়)

```
বল্লভরাজ (পীঠীর)      মহন (রাষ্ট্রকুট)      চন্দ্র (গহড়বালবংশীয়)
      |                      |                      |
দেবরক্ষিত       +       শঙ্করদেবী               মদনচন্দ্র
                             |                      |
                        কুমরদেবী + গোবিন্দচন্দ্র (১১১৪-১১৫৪)
```

(৩৮) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ২৫৮ পৃঃ।

(৩৯) "বারাণসীং ভুবনরক্ষণদক্ষ একো।
দুষ্টাৎ তুরুস্কসুভটাদবিতুং হরেণ।
উক্তো হরিসস্ পুনরত্র বভুব তস্মাদ
গোবিন্দচন্দ্র ইতি [চ] প্রথিতাভিধানৈঃ ॥১৬॥"

কুমরদেবীর প্রশস্তি

Epi. Ind. Vol. IX. pp. 323ff.

(৪০) গৌড়রাজমালা ৬৯ পৃঃ। আক্রমণকারিগণের হিন্দুস্থানে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কথা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে হইলেই ধর্মকেন্দ্র বারাণসীর দিকেই বিধর্ম্মিগণের আগমন স্বাভাবিক। Elliot, Vol. II, p. 2[illegible]1.

মুসলমান কর্তৃক বারাণসী ধ্বংস : ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চাঁদের নাম অবগত আছেন। তাঁহার জামাতা চৌহাননৃপতি পৃথ্বিরাজের চিরস্মরণীয় নামও পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। পৃথ্বিরাজ মহম্মদ ঘোরীকে বহুবার পরাজিত করিয়া নিজেও অদৃষ্টচক্রে পরাজিত হইয়াছিলেন। (৪১) এই পরাজয়ে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছিল। একে একে উত্তরভারতের সমস্ত রাজাই মুসলমানগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্রকে পরাভূত করিয়া ঘোরীর সেনাপতি কুতবউদ্দিন বারাণসীর মন্দিরাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। "তাজুল-ম-আসির" নামক মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানগণ ১০০০ মন্দির চূর্ণ করিয়া তৎস্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ঘোরী তৎপরে বারাণসী ও তাহার উপকণ্ঠের শাসনবিধান করিয়া গজনী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। (৪২) কামিলুৎ তওয়ারিখ্ নামক অন্য মুসলমান ইতিহাসে আছে যে, বারাণসীর রাজা ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা। ঘোরীর সৈন্যগণ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বারাণসীকে সর্ব্বস্বান্ত করেন। সমস্ত হিন্দুর রক্তে মহীতল প্লাবিত হয়, অপরিমিত ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করা হয়। ঘোরী নিজেও বারাণসীতে আসিয়া ১৪০০ উষ্ট্র পৃষ্ঠে ধনরাশি বোঝাই করিয়া গজনীর দিকে চলিয়া যান। (৪৩) নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, বারাণসীর হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সারনাথের বৌদ্ধকীর্তিগুলিও মুসলমানগণের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। (৪৪) সেই হইতে সারনাথের বিহার চিরপতিত হইল, আর সমসাময়িক ইতিবৃত্ত তাহার কাহিনী বলিতে পারে না। মুসলমানগণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মানিতেন না সেই জন্য মুসলমান ইতিহাসে কুত্রাপি 'বৌদ্ধ' নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

সারনাথ বিহারের তিরোভাব : ধর্ম্মচক্র বিহারের অধঃপতন-রহস্য বুঝিতে হইলে সমগ্রভাবে বৌদ্ধসমাজধ্বংসের কারণ-পরম্পরার কিঞ্চিৎ আলোচনারও

(৪১) রাজপুত শৌর্য্যের কথা বলিতে কেহই সত্যের অপলাপ করিতে পারেন নাই। Lane Poole's "Mediaeval India p 61.

(৪২) Elliot's History of India, Vol. II. pp. 223, 224.

(৪৩) Ibid, pp. 250-251.

(৪৪) "It was, no doubt, this violent overthrow of Hindu rule in Hindusthan which brought about final destruction and abandonment of the Great Convent of the Turning of the wheel of the Law in Sarnath Catalogue, Vogel's Introd, p, 8.

প্রয়োজন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিকতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজবলেরও হীনাবস্থা লক্ষ্য করা গিয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে উত্তর ভারতে খণ্ড খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হেতু জনসাধারণের ন্যায় বৌদ্ধসমাজকেও নানা রাষ্ট্র বিপ্লব সহ্য করিতে হইয়াছিল। আবার হর্ষের পর বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিলোপের জন্য কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শুধু দার্শনিক বিচারে বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শৈবমতের জীবন দান করিয়া নানা স্থানে শৈবমঠ মন্দিরাদিও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় হইতেই শৈব ও শাক্তমত বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠে। হিন্দু নৃপতিগণ বৌদ্ধ-সমাজকে কিছু কিছু সাহায্য করিলেও, হিন্দু সমাজ তাঁহাদের অনুকূল্যে উত্তরোত্তর যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিল, বৌদ্ধ-সমাজও সেইভাবে ক্ষীণতর হইতেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণের আগমনের সহিতও বৌদ্ধ-সমাজের পতনের নানা সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৌদ্ধগণের মধ্যে নৈতিক অবনতির যে বিষ প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই বৌদ্ধসমাজ-দেহকে ক্রমে ক্রমে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছিল। এই সকল কারণে হিন্দুগণের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছিল। এইরূপে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর শিথিল বৌদ্ধসমাজের চরম দশা একটি আকস্মিক কারণেই ঘটিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে "গর্গযবন কালান্তক কাল" তুরুষ্কগণ বায়ুকোণ হইতে একটি ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় আসিয়া সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিল, তাহাতে উত্তরাপথের হিন্দুর জয় উড়িয়া গেল, মঠ-মন্দির চূর্ণ হইল, নরনারীর রক্তে গঙ্গা বহিল, বৌদ্ধসমাজও এক ফুৎকারে ধরণীতল হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল। হিন্দুরাজত্ব গেল, হিন্দু সভ্যতা একেবারে গেল না, মাঝে মাঝে হিন্দু গৌরব আবার মাথা তুলিয়াছিল। বারাণসী এক সময়ের জন্য বিধ্বস্ত হইয়া ডুবিল, আবার কালস্রোতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সারনাথের বৌদ্ধ সমাজ কাল-জলধির অতলতলে একবার যে ডুবিল আর কখনও উঠিয়াছিল কি?

[মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ় ১৩২৫]

পালিসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

পূর্ণানন্দ শ্রমণ

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পালিসাহিত্যকে প্রধানতঃ বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধবচন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভগবান্ বুদ্ধ নিজে যে সকল আদেশ ও উপদেশ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধস্থবির-স্থবিরার যে সকল উপদেশ তিনি অনুমোদন করিয়াছিলেন, সমুদয় একত্রে বুদ্ধবচন নামে অভিহিত। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধাচার্য্যগণ বুদ্ধবচন অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তৎসমুদয়কে আমরা বৌদ্ধবচন নামে অভিহিত করিতেছি।

বুদ্ধবচন স্থবিরবাদ, আর্য্যবাদ, বিভাজ্যবাদ, পালি, তন্তী, পর্য্যাপ্তি ও Buddhist canon নামে প্রসিদ্ধ। শ্রেণীবিভাগ অনুসারেও ইহার কতকগুলি নাম আছে। যথা—ধর্ম্মবিনয়, ত্রিপিটক, পঞ্চনিকায়, নবাঙ্গ জিনশাসন ও চুরাশী সহস্র ধর্ম্মখণ্ড। বৌদ্ধবচনকে ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে Ex-canonical works.

বুদ্ধবচনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সুমঙ্গলবিলাসিনী ও অত্থসালিনী বলেন, "সব্বম্পি বুদ্ধবচনং রসবসেন একবিধং, ধম্ম-বিনয় বসেন দুবিধং, পঠম-মজ্ঝিম-পচ্ছিম-বসেন তি-বিধং তথা পিটকবসেন নিকায়-বসেন পঞ্চবিধং, অঙ্গবসেন নব-বিধং ধম্মক্খন্ধবসেন চতুরাসীতিসহস্সবিধন্তি বেদিতব্বং।"

"সমগ্র বুদ্ধবচন রসহিসাবে এক শ্রেণীর ও ধর্ম্ম বিনয় হিসাবে দুই শ্রেণীর। প্রথম মধ্যম ও পশ্চিম হিসাবে উহা তিন ভাগে, পিটক হিসাবেও তিনভাগে, নিকায় হিসাবে পাঁচভাগে, অঙ্গ হিসাবে নয় শ্রেণীতে ও ধর্ম্মখণ্ড হিসাবে চুরাশী সহস্র ধর্ম্মখণ্ডে বিভক্ত।"

১। অভিসম্বোধি সম্যক্ সম্বোধিলাভ ও মহাপরিনির্ব্বাণলাভের মধ্যে পূরো পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষকাল ব্যাপিয়া ভগবান বুদ্ধ দেবতা, মনুষ্য, নাগ, যক্ষ প্রভৃতির নিকট যাহা কিছু প্রচার করিয়াছিলেন সমস্তই একমাত্র বিমুক্তি রসে আপ্লুত ছিল। এই কারণে বুদ্ধবচন রসহিসাবে মাত্র এক শ্রেণীর।

২। ধর্ম্ম ও বিনয় হিসাবে বুদ্ধবচন দুই শ্রেণীর। এই সম্বন্ধে শ্রীমান্ বেণীমাধব বড়ুয়া এম্, এ লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম ও বিনয় বৌদ্ধধর্ম্ম সাহিত্যের অতি প্রাচীন বিভাগ। বুদ্ধ তাঁহার সার্ব্বজনীন নীতিমূলক উপদেশ-গুলিকে ধর্ম্ম ও আদেশমূলক বাণী সমূহকে বিনয় নামে অভিহিত করিতেন। ধর্ম্ম বলে—ইহা করা তোমার কর্ত্তব্য এবং বিনয় বলে—ইহা তোমাকে করিতেই হইবে, যদি না কর এইরূপে দণ্ডিত হইবে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, ধর্ম্ম নীতিবিষয়ক উপদেশ এবং বিনয় বিধি বা আইন।" ধর্ম্ম বিনয় শব্দটি বৌদ্ধসাহিত্যে যেরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে

বুঝিতে হয় যে উহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞাপিত হইত, এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন মানসেই 'ইমস্মিং ধম্ম-বিনয়ে' এইরূপ বিশেষাত্মক সংজ্ঞা বৌদ্ধসাহিত্যের স্থানে স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হয় যে, প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই উপদেশ ও আদেশ প্রধানতঃ এই দুইটী জিনিষ বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে, বুদ্ধের দেহত্যাগের তিন মাস পরে বুদ্ধবচন সংগ্রহ করিবার মানসে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। ৫০০ জন খ্যাতনামা অগ্রনিক্ষিপ্ত * স্থবির সভায় যোগদান করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আনন্দ ছিলেন ধর্ম্ম বিষয়ে বহুশ্রুত এবং উপালি ছিলেন বিনয় বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী। স্থবির মহাকাশ্যপ সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং উপালিকে বিনয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উত্তর সমূহ অন্যান্য স্থবির কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পর উহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপে ধর্ম্ম বিনয় বা প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে হয় যেন ধর্ম্ম বিনয় ত্রিপিটকের নামান্তর মাত্র। সুমঙ্গলবিলাসিনীর গ্রন্থকার বলিয়াছেন "তত্থ বিনয়পিটকং বিনয়ো, অবসেসং বুদ্ধবচনং ধম্মো।" "বিনয় পিটক বিনয় সংজ্ঞার এবং অবশিষ্ট বুদ্ধবচন অর্থাৎ সুত্তপিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক ধর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।" কিন্তু দীপবংশের গ্রন্থকার বলিতে চাহেন যেন আগম বা সুত্ত পিটক তথাকথিত ধর্ম্ম বিনয়ের বহির্ভূত কিংবা উহাই কেবল ধর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে ধর্ম্ম বিনয় সংগ্রহ বর্ণনা করিয়া শেষভাগে বলিয়াছেন,—

> "পবিভজ্জ ইমং থেরা সদ্ধম্মং অবিনাসনং।
> বগ্গপঞ্ঞাসকন্নাম সংযুত্তঞ্চ নিপাতকং।।
> আগম পিটকং নাম অকংসু সুত্তসম্মতং।।"

"স্থবিরগণ এই অবিনাশী সদ্ধর্ম্মকে বগ্গ, পঞ্ঞাস, সংযুত্ত ও নিপাত হিসাবে সুন্দর ভাবে বিভক্ত করিয়া সুত্রানুসারে আগম পিটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক ইহা এক মহা সমস্যার বিষয় যে, প্রথম বৌদ্ধ-সভায় অভিধর্ম্ম-পিটক প্রণীত হইয়াছিল কি না। তিব্বতীয় গ্রন্থগুলি এইরূপ কোন গোল-যোগে না যাইয়া সোজাসুজি ভাবে বলিতে গিয়াছেন, আনন্দ সূত্র-পিটক, উপালি বিনয়-পিটক এবং মহাকাশ্যপ অভিধর্ম্ম-পিটকের মাত্রিকা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

* অগ্রনিক্ষিপ্ত—এতদগ্রে স্থাপিত; কোন বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া ভগবান্ বুদ্ধ হইতে উপাধিপ্রাপ্ত।

৩। বুদ্ধ বচনগুলি প্রথম, মধ্যম, এবং পশ্চিম হিসাবেও বিভক্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থ সিদ্ধিলাভের পর যে উদাস গীতি গাহিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রথম বাক্য।

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।।"

ইত্যাদি।

অপর কাহারও কাহারও মতে, "যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্স।" ইত্যাদি। খন্ধক গ্রন্থে উদ্ধৃত গাথাই তাঁহার প্রথম বাক্য। দেহত্যাগ করিবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি ভিক্ষু সংঘকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পশ্চিম বা সর্বশেষ বাক্য। "হন্দ দানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি বো বয় ধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।"

এই দুই বাক্যের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিনি যে সকল বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তৎসমুদয় তাঁহার মধ্যম বাক্য নামে প্রসিদ্ধ।

৪। পিটক হিসাবেও বুদ্ধবচন তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—বিনয় পিটক, সুত্তান্ত পিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক। পিটক শব্দের অর্থ ঝাঁড়ি, পেঁটরা। বিনয় পিটকের অপর নাম 'আনা দেসনা' বা আদেশ বাণী; সুত্তান্ত পিটকের অপর নাম 'বোহারো দেসনা' বা ব্যবহারি বাণী; এবং অভিধর্ম্ম পিটকের অপর নাম 'পরমত্থ দেসনা' বা পারমার্থিক বাণী। বিনয় পিটকের অপর নাম 'সংবরা-সংবর-কথা', সংযম-অসংযম বিষয়ক কথা, সুত্তান্ত পিটকের অপর নাম 'দিট্ঠি-বিনিবেঠন কথা' মিথ্যাদৃষ্টি-বেষ্টন বিষয়ক কথা; এবং অভিধর্ম্ম পিটকের অপর নাম 'নামরূপ পরিচ্ছেদ-কথা।'—বিনয় পিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অধিশীল সিক্খা', —শীল বা সদাচার; সুত্তান্ত পিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অধিচিত্ত সিক্খা', —সমাধি; এবং অভিধর্ম্ম পিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অধিপঞ্ঞা সিক্খা' —প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। বিনয় পিটকের অন্তর্গত পাতিমোকখ, বিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবার এই চারি গ্রন্থ; সুত্তান্ত পিটকের অন্তর্গত পঞ্চ নিকায়, যথা—দীঘ মজ্ঝিম সংযুত্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক। তন্মধ্যে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পনরটি পুস্তক; যথা—খুদ্দক পাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতি-বুত্তক সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থের গাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসংভিদা, অপদান, বুদ্ধবংশ ও চরিয়া পিটক। কিন্তু দীঘভাণক-শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত মাত্র বারটী পুস্তক। যথা—জাতক, মহানিদ্দেস চুল্লনিদ্দেশ, পটিসংভিদা, মগ্গ, সুত্ত নিপাত, ধম্মপদ, উদান, ইতি-বুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থের-গাথা ও থেরীগাথা। মজ্ঝিমভাণক শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে পনরটি পুস্তক, যথা—দীঘভাণকের বারটী পুস্তক, চরিয়া পিটক, অপদান ও বুদ্ধবংশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দীঘভাণক ও মজ্ঝিম-

ভাণকের তালিকায় খুদ্দক পাঠের উল্লেখ নাই এবং নিদ্দেশের পরিবর্তে মহানিদ্দেশ ও চুল্লনিদ্দেশ উল্লিখিত আছে। অভিধর্ম্ম পিটকের অন্তর্গত সাতটী প্রকরণ। যথা—ধম্মসঙ্গণি বা ধর্ম্মসংগ্রহ, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক ও পট্ঠান। তন্মধ্যে কথাবত্থু রাজা অশোকের সময় ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাঞ্চিস্তূপের প্রাচীর গাত্রে পেটকী (যিনি পিটকশাস্ত্র জানেন) নাম দৃষ্ট হয়।

৫। নিকায় হিসাবে বুদ্ধবচন পঞ্চ ভাগে বিভক্ত। যথা—দীঘ-নিকায়, মজ্ঝিম-নিকায়, সংযুক্ত-নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়। এই শ্রেণী বিভাগ অনুসারে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পূর্ব্বোল্লিখিত পনরটী পুস্তক এবং সমগ্র বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটক। রাজা অশোকের সাঞ্চিস্তূপের প্রাচীর-গাত্রে পঞ্চ-নেকায়িক (যিনি পঞ্চ নিকায় জানেন) নামটী দৃষ্ট হয়।

৬। অঙ্গ হিসাবে বুদ্ধ-বচন নয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—সুত্ত, গেয়্য, বেয়্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্ভুতধম্ম ও বেদল্ল।

"সুত্তং গেয়্যং বেয়্যাকরণং গাথুদানীতিবুত্তকং।
জাতকব্ভুতবেদল্লং নবঙ্গং সত্থু-সাসনং॥"

নেপালী বৌদ্ধেরা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থকে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। মহাবৈপুল্যসূত্র অবদান প্রভৃতি তিন চারি নামই উক্ত তালিকার অতিরিক্ত।

বিভঙ্গ, নিদ্দেশ, খন্ধক, পরিবার সুত্তনিপাতে মঙ্গল-সুত্ত, রতন-সুত্ত, নালক-সুত্ত, তুবটকসুত্ত প্রভৃতি ও সুত্ত নামধেয় অন্যান্য বুদ্ধবচন সুত্তসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

যে সকল সূত্রের মধ্যে গাথা বিদ্যমান আছে তৎসমুদয় গেয়্য নামে অভিহিত। দৃষ্টান্তস্থলে সংযুক্ত নিকায়ের সগাথ-বগ্গ।

সমগ্র অভিধম্ম পিটক, অন্যান্য আটশ্রেণীর বহির্ভূত গাথাশূন্য সুত্তগুলি বেয়্যাকরণ নামে অভিহিত।

ধম্মপদ থেরগাথা, থেরীগাথা, ও সুত্তনিপাতের শুদ্ধগাথাগুলি গাথা শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভাবাবেশে যে সকল উচ্ছ্বাস গীতি গীত হয়, তৎসমুদয় উদান নামে অভিহিত। দৃষ্টান্তস্থলে, খুদ্দক নিকায়ে উদান পুস্তক।

ইতিবুত্তকে বুদ্ধের উক্তি সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রত্যেক সূত্রের প্রারম্ভে লিখিত আছে; "বুত্তং হেতং ভগবতা"।

ভগবান্ বুদ্ধের অতীত জন্ম বিষয়ক পুস্তকের নাম জাতক।

যে সকল সূত্রে আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বিষয় সমূহ আলোচিত হইয়াছে তৎসমুদয় অব্ভুতধম্ম সংজ্ঞায় অভিহিত।

চুল্লবেদল্ল, মহাবেদল্ল, সম্মাদিট্ঠি, সক্কপঞ্হ, প্রভৃতি যে সকল সূত্রের

প্রশ্নোত্তর শুনিলে হৃদয়ে বেদ (আনন্দ) ও জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহাদের নাম বেদল্ল।

৭। ধম্মখণ্ড হিসাবে বুদ্ধবচন চুরাশী সহস্র ধম্মখণ্ডে বিভক্ত। এক বিষয়ক সুত্ত একটি ধম্মখণ্ড। বিষয় বিভিন্ন হইলে প্রত্যেক সুত্তে একাধিক ধম্মখণ্ড হইতে পারে। গাথা বদ্ধে প্রশ্নভাগ একটি ধম্মখণ্ড; উত্তর ভাগ অপর এক ধম্মখণ্ড। ইত্যাদি।

কথিত আছে, বুদ্ধ বচনের মধ্যে ৮২,০০০ বিষয় বুদ্ধের দ্বারা এবং ২০০০ বিষয় স্থবির স্থবিরগণ দ্বারা আলোচিত হইয়াছিল। সিংহলী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে রাজা অশোক ৮৪০০০ ধম্মখণ্ডের সম্মানার্থে ৮৪০০০ স্তূপ, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সুমঙ্গলবিলাসিনীর গ্রন্থকার বলেন, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী বিভাগ ভিন্ন, ত্রিপিটকের মধ্যে উদ্দান সঙ্গহ, বগ্গ-সঙ্গহ, পেয়্যাল-সঙ্গহ, নিপাত-সঙ্গহ, সংযুত্ত-সঙ্গহ, পণ্ণাস সঙ্গহ প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার বিষয় বিন্যাস আছে।

নেত্তি-পকরণের গ্রন্থকার সাসনপট্ঠানে সুত্তকে আলোচ্য বিষয় অনুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

(১) বাসনা বিষয়ক সুত্ত; (২) নিব্বেধ বিষয়ক সুত্ত; (৩) অসেক্খ বা অর্হৎ বিষয়ক সুত্ত; (৪) সংকলুষ বিষয়ক সুত্ত; (৫) সংকলুষ ও বাসনা বিষয়ক সুত্ত; (৬) সংকলুষ ও নিব্বেধ বিষয়ক সুত্ত; (৭) সংকলুষ ও অসেক্খ বিষয়ক সুত্ত; ইত্যাদি।

আধুনিক সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগের দিক্ দিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, বুদ্ধবচনে উপন্যাস, নবন্যাস, কাব্য, নাটক প্রভৃতি নাই। নীতিশাস্ত্র, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, জীবন চরিত, পুরাণ, গীতি কবিতা প্রভৃতি আছে। স্থানে স্থানে কাব্য ও নাটকের ছায়া পরিদৃষ্ট হয়।

বুদ্ধবচনের শ্রেণী বিভাগের ধারা নির্ণীত হইল। এখন আমরা বৌদ্ধবচন আলোচনা করিব।

পালিতে ত্রিপিটকের বহির্ভূত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধাচার্য্যগণ ত্রিপিটক বুঝাইবার সুবিধা কল্পে ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানেও সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে অনেক পুস্তক প্রণীত হইতেছে। অধিকন্তু দেখা যায়, বৌদ্ধবচনকেও বুদ্ধবচনের ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধবচনের মধ্যে ব্যাকরণই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থকথা (commentary), টীকা (Sub-commentary), অনুটীকা, মধুটীকা, ব্যাকরণ (Grammars), প্রভৃতিকে ব্যাকরণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত

করা যাইতে পারে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ ধর্ম্মপাল ও অন্যান্য কতিপয় স্থবিরের লিখিত ত্রিপিটকের ব্যাখ্যাগুলিই অর্থকথা নামে প্রসিদ্ধ। অত্থসালিনী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, বুদ্ধঘোষ যখন লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন তখন তথায় মহাবিহারট্ঠ কথা, পোরাণট্ঠ কথা, প্রভৃতি বিবিধ অর্থকথা প্রচলিত ছিল। তৎসমুদয়ের সাহায্যেই বুদ্ধঘোষ তাঁহার নিজের অথকথাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। মহাবংশের মতে, ত্রিপিটকের সহিত উহাদের অর্থকথাগুলি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে আবৃত্তি করা হইয়াছিল। রাজা অশোকের পুত্র আয়ুষ্মান মহেন্দ্রই তৎসমুদয়কে সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অর্থকথার প্রাচীনত্ব বিঘোষিত করিবার জন্যই কি মহাবংশের গ্রন্থকার এইরূপ কিংবদন্তীর অবতারণা করিলেন কিংবা সত্যসত্যই অর্থকথা ও মূলগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করা হইয়াছিল? বাস্তবিক এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও দুষ্কর। আমাদের ধারণা এই যে, ত্রিপিটক গ্রথিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে বৌদ্ধাচার্য্যগণের মুখে মুখে অর্থকথার ন্যায় কিছু প্রচলিত ছিল। নচেৎ ত্রিপিটকের অর্থ অনেক স্থলে দুরূহ বোধ হইত। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, ত্রিপিটকের স্থানে স্থানে আমরা যে সকল নিদ্দেস দেখিতে পাই, তদনুসারেই পরবর্ত্তীকালে অর্থকথা সমূহ বিরচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অন্তত আমরা ইহা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি যে, বুদ্ধঘোষের বহুপূর্ব্বে অর্থকথা সমূহ প্রণীত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত অর্থকথাগুলি বুদ্ধঘোষের রচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। যথা—সমন্ত পাসাদিকা বিনয় পিটকের অর্থকথা কঙ্খাবিতরণী পাতিমোক্খের অর্থকথা, অট্ঠসালিনী ধম্মসঙ্গণির, সম্মোহ বিনোদনী বিভঙ্গ পকরণের ধাতুকথাপকরণট্ঠকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি পকরণট্ঠকথা কথাবত্থুট্ঠ কথা, যমক পকরণট্ঠকথা, পট্ঠানপকরণট্ঠকথা, সুমঙ্গলবিলাসিনী দীঘনিকায়ের অর্থকথা, পপঞ্চসূদনী মজ্ঝিম নিকায়ের অর্থকথা, সারত্থপ্পকাসিনী সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথা এবং পরমত্থজোতিকা খুদ্দকপাঠ ধম্মপদ সুত্তনিপাত ও জাতকের অর্থকথা।

ভদ্রতীর্থবাসী ধম্মপাল স্থবির পরমত্থদীপনী নামে উদান ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা ও চরিয়া পিটকের অর্থকথা রচনা করিয়াছিলেন।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত অবশিষ্ট চারিটী গ্রন্থেরও অর্থকথা বিদ্যমান আছে। যথা—উপসেন স্থবিরের কৃত সদ্ধম্মপজ্জোতিকা নিদ্দেসের অর্থকথা; মহানাম স্থবিরের কৃত সদ্ধম্মপকাসিনী পটিসম্ভিদা মগ্গের অর্থকথা; বুদ্ধদত্ত স্থবিরের কৃত মধুরত্থপকাসিনী বুদ্ধবংশের অর্থকথা; এবং বিসুদ্ধজনবিলাসিনী অপদানের অর্থকথা। এই শেষোক্ত অর্থকথার গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই।

অর্থকথার পালা প্রায় শেষ হইল। এক্ষণে আমরা টীকার পালা আরম্ভ করিব। অর্থকথাগুলির ভাষা স্থানে স্থানে সহজবোধ্য নহে বলিয়া পরবর্তী আচার্যগণ অর্থকথা সমূহের টীকাদি প্রণয়ন করেন। ত্রিপিটকের সম্বন্ধে বারখানি টীকা গ্রন্থ বর্তমান আছে। যথা—সারত্থদীপনী, বিমতীবিনোদনী, ও বজিরবুদ্ধি টীকা-সমন্তপাসাদিকা নামিকা বিনয়ট্ঠকথার টীকা; বিনয়ত্থ মঞ্জুসা কঙ্খাবিতরণীর টীকা। প্রথম সারত্থমঞ্জুসা সুমঙ্গলবিলাসিনীর, দ্বিতীয় সারত্থমঞ্জুসা অপথ্য নন্দনীর, তৃতীয় সারত্থমঞ্জুসা সারত্থপকাসিনীর ও চতুর্থ সারত্থমঞ্জুসা মনোরথপূরণীর টীকা। সেইরূপ মূলটীকা সপ্তপ্রকরণ অভিধর্মের অর্থকথা সমূহের, প্রথম পরমত্থপকাসনী অত্থসালিনীর, দ্বিতীয় পরমত্থপকাসনী সম্মোহবিনোদনীর ও তৃতীয় পরমত্থপকাসনী অভিধর্মের শেষ পাঁচখানি প্রকরণের অর্থকথা সমূহের টীকা।

পালিতে ব্যাকরণের সংখ্যাও কম নহে। কচ্চায়ন, কচ্চায়ন-বুত্তি, কচ্চায়ন-বণ্ণনা, মহারূপসিদ্ধি, বালাবতার, মোগ্গল্লান, চূলনীতি, পযোগসিদ্ধি, আখ্যাত-পাদ, ধাতুমঞ্জুসা, মহাসদ্দনীতি, মুখমত্তদীপনী পালি ব্যাকরণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যাকরণ সংজ্ঞার অন্তর্ভূত অন্যান্য গ্রন্থও দৃষ্ট হয়। যথা—অভিধম্মত্থসঙ্গহ ও উহার টীকা, অভিধম্মাবতার ও উহার টীকা।

অভিসম্বোধি অলঙ্কার নামে অলংকার শাস্ত্র সম্বন্ধেও একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে।

পালি কাব্যের মধ্যে জিনচরিত, জিনালংকার তেলকটাহগাথা, মালালংকার-বত্থু, সমন্তকূটবণ্ণনা ও অনাগতবংস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীন, নীতি, বিনয় প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থেরও অভাব নাই। কিন্তু আমরা মনে করি যে, বংশ শ্রেণীর গ্রন্থগুলিই বৌদ্ধবচনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বংশ শব্দের অর্থ Chronicle ইতিবৃত্ত, এক প্রকার ইতিহাস। বংশশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে দীপবংস, মহাবংস, শাসনবংস, গন্ধবংস, দাঠাবংস, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ সংস্কৃতে অবদান নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—অবদানকল্পলতা, দিব্যাবদান ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতিরিক্ত পালিতে অভিধান শ্রেণীর গ্রন্থও দৃষ্ট হয়। যথা—অভিধান-প্পদীপিকা ও অভিধানপ্পদীপিকা সূচি।

বৌদ্ধবচনের মধ্যে অপর দুইটী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গ্রন্থ দুইটী জগৎপ্রসিদ্ধ। উহাদের নাম—বিসুদ্ধিমগ্গ ও মিলিন্দপঞ্হো। তন্মধ্যে বিসুদ্ধিমগ্গকে বলা যাইতে পারে Buddhist Encyclopadia এবং মিলিন্দ পঞ্হোকে বলা যাইতে পারে প্রাচীন ভারতের আদর্শ পৌরাণিক উপন্যাস (Historical Romance). [সাহিত্য, মাঘ ১৩২১]

বঙ্গভাষায় বৌদ্ধস্মৃতি*

রমেশ বসু

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের নানারূপ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। বৌদ্ধ রাজাদের অনুশাসন, বৌদ্ধ শিল্পীর নির্মিত মূর্তিগুলিই তখনকার ইতিহাসের পক্ষে প্রধান অবলম্বন। এইসব ঐতিহাসিক উপকরণ হইতে আমরা তখনকার সমাজের যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহা বৌদ্ধদের নিজেদের মত। তখনকার বিদেশী বৌদ্ধভ্রমণকারীরা যে বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও বৌদ্ধদের প্রশংসাই আছে।

বৌদ্ধযুগেও বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম নির্বাসিত হয় নাই। অনেক সময়ে দেখা যায়, একই শহরে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মন্দির পাশাপাশি বর্তমান ছিল। ক্রমে সনাতনী হিন্দু ও মহাযানী বৌদ্ধ পরস্পর একটা আপোষের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। বৌদ্ধ রাজাদের সময়কার অনুশাসনে আমরা দেখিতে পাই রাজদরবারে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং মহাভারত শোনায় কোনো বাধা ছিল না।

যে-বঙ্গভাষায় বৌদ্ধগণই হয়ত প্রথম গ্রন্থ লিখিয়া ইহাকে গৌরব দান করিয়াছিলেন সেই ভাষায় তাহাদের স্মৃতি কিরূপভাবে রক্ষিত হইয়াছে তাহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় যে ধর্ম সমাজের উপরে কোনো সময়ে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে, তাহার সেই প্রভাবের ছাপ সেই সময়কার ভাষার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব, পালিতে বৌদ্ধপ্রভাব ও প্রাকৃতে জৈন প্রভাব অতি পরিষ্কার ভাবেই ধরা পড়ে। বঙ্গভাষায় বৌদ্ধেরা কতকগুলি আধ্যাত্মিক রূপক-মূলক গান রচনা করিয়াছিলেন ইহা আমরা জানি, কিন্তু তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তাও এভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিবার উপায় নাই।

বৌদ্ধদের স্মৃতিসূচক বাঙলা শব্দগুলি লইয়া আলোচনা করিলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বৌদ্ধরা নিজেরাই ভাল অর্থে ব্যবহার করিত, এবং হিন্দুরাও ভাল অর্থেই ব্যবহার করিত বলিয়া মনে হয়। কারণ এই শব্দগুলি আদিতে কোন বিশেষের অর্থ

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দশ (নৈহাটী—১৩৩০) অধিবেশনের জন্য লিখিত।

বহন করিত না। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের কতকগুলি এখনও ভাল অর্থেই ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশেরই অর্থ-হিসাবে অবনতি ঘটিয়াছে। যেমন এখন 'পাষণ্ড' বা ডাকিনী' বলিলে কাহাকেও সম্মান করা ত হয়ই না, বরং লোকসমক্ষে অপদস্থ করা হয়। তৃতীয়তঃ, হয় বৌদ্ধদের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে অথবা বৌদ্ধদের প্রতি বিরাগবশতঃ হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে কতকগুলি শব্দকে খরাপ অর্থে এমন কি গালি-স্বরূপে ব্যবহার করিত। শব্দগুলির পরিবর্তন দেখিয়া মনে হয় বৌদ্ধ প্রভাবের পরে নবগঠিত ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজ বৌদ্ধদিগকে সমাজে অপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে 'কুৎসিত' ভাবে চিত্রিত করিয়াছে। এইসব শব্দের সাহায্যে সেকালের বৌদ্ধদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে ধার্ম্মিক বিদ্বেষের বিষও মিশান আছে। এরূপ চেষ্টা সব দেশেই দেখা যায়। যেমন ইউরোপে মধ্যযুগের খৃষ্টীয় মহাপণ্ডিত Duns Scotus-এর শিষ্যগণ পরবর্তী রেনেসান্স যুগের নবীনপন্থী পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক মূর্খ রূপে বিবেচিত হওয়ার ফলে তাহাদের গুরুর নাম Duns হইতে মূর্খ-বাচক dunce শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ, আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ নাগাচার্যকে 'দিগ্‌গজ' করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, বঙ্গদেশের কতকগুলি প্রাচীন স্থানের নাম এখনও বৌদ্ধস্মৃতি বহন করিতেছে। পঞ্চমতঃ, বাঙালীর পদ্ধতি বা বংশনাম প্রাচীন ভারতের স্মৃতি বহন করিয়া আনিলেও কোথাও কোথাও বৌদ্ধভাব জড়িত বলিয়া মনে হয়। ধর্মমত-সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া বৌদ্ধদের অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুরা উদাসীন ছিলেন, যেমন,—বৌদ্ধ শিল্প বা সাহিত্যের নিন্দা দেখা যায় না, এমন কি উল্লেখই পাইবার উপায় নাই। বোধ হয় ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীরা বৌদ্ধদের যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার নিন্দা করেন নাই, শুধু তাহাদের মত ও পন্থাকে নিন্দা করিতেন।

বৌদ্ধদের সম্পর্কে অতি প্রাচীন কতকগুলি শব্দ বাঙ্‌লা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে—ইহার মধ্যে সংস্কৃত ও পালি শব্দ আছে।

পাষণ্ড—এই শব্দটির ইতিহাস অতি বিচিত্র। ইহার আসল ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। আদিতে যে ইহা ব্যবহৃত হইত, তাহা মনে হয় না। অশোক-অনুশাসনের দ্বাদশ গিরিলিপিতে আমরা পাই 'আত্পপাসংডপূজা' ও 'পরপাসংডগরহা' এবং জৈনদিগের উবাসগদসাও গ্রন্থে (পঢ়মং অজ্‌ঝয়ণং ৪) ...পরপাসণ্ডপসংসা প্রভৃতি কথাগুলি পাওয়া যায়; এখানে পাসণ্ড মানে ধর্মাচার্য। নিন্দা বা প্রশংসা হিসাবে এ শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ নিজের ও পরের উভয় ধর্মাচার্যকেই পাসংড বলা হইয়াছে। পরে এই শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ও অবনতি হইয়া শুধুই বিরুদ্ধবাদীর প্রতি প্রযুক্ত হইতে থাকে। বৌদ্ধদিগের ব্রহ্মজাল সুত্তে ৯৬ প্রকারের পাষণ্ড বা ভিন্ন ধর্মা-

বলম্বীর উল্লেখ আছে। ক্রমে বেদবিরুদ্ধবাদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দুগণ এই শব্দটি ব্যবহার করিতেন। এই শব্দটি নানা ধর্মীদের দ্বারা নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও অবশেষে সংস্কৃত ভাষায় ইহার সমস্ত বোঝা বৌদ্ধদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বাঙলার বৈষ্ণব সাহিত্যে বৌদ্ধ ও মায়াবাদিদিগকে পাষণ্ড ও পাষণ্ডী বলা হইয়াছে। শীতলার উপাসকগণ (ইহারা কি পূর্বে বৌদ্ধ ছিল?) কিন্তু ফিরাইয়া বৈষ্ণবদিগকে পাষণ্ড বলিতে ছাড়ে নাই। আবার ধর্মপূজার বিরোধীকে ঘনরাম পাষণ্ড বলিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা "প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন" (চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্য-৩য় পরিচ্ছেদ) সমান ভাবেই চালাইয়াছিলেন।

ভণ্ড কাহারও মতে এই শব্দটি পালি ভদন্ত, ভন্ত শব্দ হইতে জাত। এই ব্যুৎপত্তি ঠিক হওয়া সম্ভব নহে। 'ভণ্ড' শব্দ সংস্কৃতে বিদূষক অর্থে পাওয়া যায়; ইহা হইতে আমাদের বাঙ্গলা ভাঁড়, যেমন গোপাল ভাঁড়। 'ভণ্ড' যে প্রতারক অর্থ, বিশেষ করিয়া ধর্মধ্বজী অর্থে যে ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে এই শব্দ বৌদ্ধদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। অনুরূপ শব্দ ভণ্ডু, পালিতে মিলে, অর্থ মুণ্ডিত-মস্তক; মিলিন্দপঞ্হে "ভণ্ডু কাসায়বাসী" শব্দ মিলে।

বিতিকিচ্ছি—অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে এই শব্দ পালি বিচিকিচ্ছা শব্দ হইতে হওয়া সম্ভব। শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া সংস্কৃত বিচিকিৎসা হইতে পালি বিচিকিচ্ছা ও আধুনিক কথিত ভাষায় বিতিকিচ্ছা হওয়া যুক্তিসঙ্গত। গ্রাম্য বাঙ্গলায় "চিকিৎসা" অর্থে "তিকিচ্ছে" শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এখন যেরূপভাবে বিতিকিচ্ছি ব্যাপার ইত্যাদি কথা ব্যবহার করি তাহার অনুরূপ কোনো কথা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে কি না জানি না। বিচিকিৎসা শব্দ সুপ্রাচীন উপনিষদেও পাওয়া যায়, কিন্তু, বৌদ্ধ-নৈয়ায়িকদের তর্কের জ্বালায় অস্থির হইয়া কি হিন্দুরা এই শব্দ ব্যবহার করিত? বিচিকিৎসা অর্থে সন্দেহ বুঝায় বলিয়াই বোধ হয়। সন্দেহবাদী বৌদ্ধদের সম্পর্কে এই শব্দ প্রযুক্ত হইত।

বাঙলা দেশে প্রাচীন পন্থী বৌদ্ধদের ও বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি মোটেই প্রখর নয়। এমন কি গুপ্ত সম্রাটদের সময়কার বা হর্ষবর্ধনের সময়কার বৌদ্ধদের কথা চীন দেশের পরি-ব্রাজকের বৃত্তান্তের মধ্যেই লুকাইয়াছিল। বাঙলা দেশের জনসাধারণের মনে, ভাষায় সে সময়ের কোন স্মৃতি খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। ইহার বহুদিন পরে গৌড়ের পাল রাজাদের সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বাঙলা দেশে যখন প্রবল হয়, তখন হইতে প্রচলিত কতকগুলি সংস্কৃত ও অনেকগুলি বাঙলা শব্দ আলোচনা করিলে বাঙলা দেশের মধ্যযুগের বৌদ্ধদের একটি স্মৃতি-চিত্র আঁকিয়া তোলা যায়। এই চিত্রটিতে হিন্দুরা যে রং ফলাইয়াছে তাহাতে কালোর ভাগই যেন কিছু বেশী।

পণ্ডিত—সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত শব্দ দ্বারা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যার, এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়। এই ব্যুৎপত্তি কতদিনের ভাষাজ্ঞানীরা তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন পালি জাতক গ্রন্থে আমরা পণ্ডিত শব্দটি পাই যেমন দশরথ-জাতকে রামকে রামপণ্ডিত বলা হইয়াছে। এখানে পণ্ডিত শব্দের বিশেষত্ব আছে—এই শব্দটি দ্বারা রামের সঙ্গে তাঁহার ভাইদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার তফাৎ দেখান হইয়াছে। এই পণ্ডিত শব্দটি হিন্দুরা বৌদ্ধদের নিকট হইতে লইয়াছেন, না বৌদ্ধরা হিন্দুদের নিকট হইতে ধার করিয়াছেন তাহা এখনকার পণ্ডিতেরাই ঠিক করিবেন। বিদ্যা-হিসাবে ভট্ট ও আচার্য শব্দই বোধ হয় বেশী ব্যবহৃত হয়। 'পণ্ডিত' শব্দ চর্যাপদের প্রাচীন বাংলায় 'পাণ্ডি-আ" রূপে মিলে। ইহার আধুনিক রূপ বাঙলায় আর বিদ্যমান নাই, তবে বিহারীতে ও হিন্দীতে 'পাঁড়ে বা পাণ্ডে' রূপে ব্রাহ্মণ-বংশ-পরিচয় হিসাবে বিদ্যমান। 'পাঁড়ে এখনও যে কোন নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ অর্থে ব্যবহৃত সামান্য নাম; যেমন রেলওয়ের "পানী-পাঁড়ে", রান্নাঘরের "পাঁড়েজী।"

বাঙালীর সঙ্গে অত পুরানো 'পাণ্ডিত্যের' সম্পর্ক নাই। আমরা ধর্মের পণ্ডিত, শীতলার পণ্ডিতদের কথাই শুধু মনে রাখিয়াছি। শূন্যপুরাণের কল্যাণে আমরা কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিতের নাম জানিতে পারি—যথা, রামাই পণ্ডিত, শেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত ও কংসাই পণ্ডিত। এঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কোনোই সম্বন্ধ নাই, কারণ এঁরা হয়ত ব্রাহ্মণও ছিলেন না, সংস্কৃত হিসাবে পণ্ডিতও ছিলেন না।

দ্বার-পণ্ডিত—এখন বাংলা দেশের জমিদার বাড়ীতে প্রধান পণ্ডিতকে দ্বার-পণ্ডিত বলা হয়। নানা দেশী পণ্ডিতেরা জমিদারদের নিকট হইতে যে বার্ষিক বিদায় পান তাহা দ্বার-পণ্ডিতের ব্যবস্থানুসারেই করা হয়। এইজন্য কোনো কোনো স্থলে এখনও প্রাচীনকালের মত বিচার সভা বসে। প্রাচীনকালের বৌদ্ধ আমলে এরূপ বিচার সাধারণত বৌদ্ধ বিহারগুলিতেই বেশী হইত। সেইজন্য প্রাচীন দ্বার-পণ্ডিত বিহারের পণ্ডিতদিগের অন্তর্ভুক্ত থাকিতেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে বৌদ্ধ বিহারের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে থাকিয়া যে পণ্ডিত প্রথমকার পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন তাঁহাকে দ্বার-পণ্ডিত বলিত।

আমরা আরও এক ধরণের দ্বার-পণ্ডিতের কথা জানি। বাঙলা-দেশে প্রচলিত ধর্ম পূজার স্থানে দ্বার-পণ্ডিতেরা ধর্মক্ষেত্রের দ্বার রক্ষা করিতেন। শূন্যপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি রামাই পণ্ডিত, শেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত ও কংসাই পণ্ডিত তাঁহাদের শিষ্যদের লইয়া চারিদিকের চারিটি দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌গজ পণ্ডিত—আমরা সাধারণ কথাবার্তায় শ্লেষ প্রকাশ করিতে যাইয়া

এই পদটি ব্যবহার করি। ইহা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগাচার্যের নামটিকে পরিবর্তিত করিয়া গঠিত হইয়াছে। এক সময়ে দিঙ্‌নাগাচার্যের তর্কজালে অস্থির হইয়া হিন্দু নৈয়ায়িক সমাজ তাঁহাকে শ্লেষের দ্বারা অমর করিয়া গিয়াছেন; কালিদাসও তাঁহার কাব্যে (মেঘদূত—পূর্বমেঘ—১৪ শ্লোক) দিগ্‌গজ শব্দ দ্বারা ইহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

নেড়া, নেড়ে—এই শব্দটির কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। ইহার দুইরূপ অর্থ করা হয়। কাহারও মতে মুণ্ডিত বৌদ্ধকে নেড়া এবং স্ত্রীলোক বৌদ্ধকে নেড়ী বলিত। কাহারও মতে মহাযানী বৌদ্ধ নাড় পণ্ডিত হইতে নাড়া বা নেড়ে হইয়াছে। এই দুই অর্থ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শেষোক্তটির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, অন্তত বাঙলা দেশে নাড় পণ্ডিতের কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায় ছিল কি না এখনও জানা যায় নাই। প্রথম অর্থ সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, যদিও এখন আমরা মাথামুড়ানো ব্যক্তিকে নেড়া বলি বটে, কিন্তু এই অর্থে, এই শব্দের প্রাচীন ব্যবহার বোধ হয় পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে নণ্ডা-মুণ্ডা বা নেড়া-মুড়া এইরূপ শব্দ ছিল জানা যায়। ইহার মধ্যে মুণ্ডা বা মুড়া শব্দ দ্বারা মাথা মুড়ানো ব্যক্তিকে বুঝাইত। সুতরাং নেড়া বা নেড়ে শব্দের অর্থ খুব পরিষ্কার হইতেছে না।

আমার মনে হয় নেড়ে শব্দটি বৌদ্ধদের ব্যবহৃত নাড়িআ শব্দ হইতে আসিয়াছে। এই নাড়িআ শব্দ বৌদ্ধ গান ও দোহায় পাওয়া যায় (পৃঃ ১৯)। এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকায় এই শব্দের অর্থ দেওয়া আছে অসম্প্রদায়যোগ্য। বৌদ্ধ সমাজের বহির্ভূত ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে নাড়িআ বা নেড়ে বলা হইয়াছে। এই হিসাবে সংস্কৃত পাষণ্ড শব্দের সঙ্গে ইহার মিল আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেদধর্ম-ত্যাগী হওয়ার ও মস্তক মুণ্ডন করার জন্য সনাতনী হিন্দুদিগের নিকট নাড়া-মুণ্ডা বা পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত নাইড়া-মুইড়া আখ্যা পাইয়াছিল।

চৈতন্যভাগবতে আমরা পাই, চৈতন্যদেব নিজে অদ্বৈত আচার্যকে বার বার নাঢ়া বলিয়াছিলেন। এইসব স্থলে মুণ্ডিত অর্থ করিলে কোন তাৎপর্যই থাকে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, অদ্বৈতাচার্য নাড়িয়ান গাঞিভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নাঢ়া বলা হইয়াছিল। তাহাও বিশেষ যুক্তি-সঙ্গত মনে হয় না—কারণ এ শব্দটির মধ্যে একটু শ্লেষ আছে। আমার মনে হয় চৈতন্যদেবের এই কথা বলার গূঢ় একটি অর্থ ছিল। বাঙলার বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি অদ্বৈত আচার্য দুইবার জ্ঞানবাদ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি ও প্রেমবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা জ্ঞানবাদী অদ্বৈত আচার্যকে নাঢ়া বা ভিন্ন সম্প্রদায়ী মনে করিলে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু অল্পপ্রাণ ড়-যুক্ত 'নাড়িয়া, নাড়্যা, নাড়া' শব্দ ও মহাপ্রাণ 'ঢ়' যুক্ত 'নাঢ়া' শব্দ যে একই, সে সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আপত্তি তুলা যায়।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। ভিন্নধর্মাবলম্বী বলিয়া মুসলমানগণ যেরূপ হিন্দুদের কাফের বলেন, হিন্দুগণও বোধ হয় সেইরূপ মুসলমানদিগকে নেড়ে (অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী) বলেন। তাহা না হইলে মুসলমানদিগকে শুধু শুধু নেড়ে বলিবার কোনো সার্থকতা থাকে না।

বাউল—এই শব্দটির বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার। কেহ কেহ ইহা বাতুল (অর্থাৎ বায়ুগ্রস্ত) শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন। তাহাতে গোড়াতেই শব্দটি সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা জন্মে। প্রাচীন সাহিত্যে কিন্তু সাধু বুঝাইতে বেশ ভাল ভাবেতেই বাউল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবকে মহাবাউলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে বাউল শব্দ নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গানে রাণী ময়নামতী তাঁহার গুরু হাড়িপাকে প্রশংসা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "হাড়ি নহে হাড়িপা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী।" এখানেও নিন্দার অবসর নাই। এই সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। বায়ুগ্রস্ত বা পাগল অর্থে যে বাউল শব্দ পরবর্তী কালের সাহিত্যে পাওয়া যায় তাহা সাধুবাচক বাউল শব্দ হইতে ভিন্ন কি না আলোচনা হওয়া দরকার। চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে আছে—"বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল।" এখানে প্রথমটি চৈতন্যকে বুঝাইতেছে ভাল অর্থে ও অপরটি বোধ হয় পাগল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখনও আমরা যাহাদিগকে বাউল বলি তাহারা বৌদ্ধদিগের অনেকগুলি মত ও ধরণধারণ বজায় রাখিয়াছে। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করিতেছি।

ভাবক—আমরা সাধারণতঃ ভাবুক শব্দটির সঙ্গেই পরিচিত, তাই ভাবক শব্দটি নূতন ঠেকিতে পারে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবদের মধ্যে ইংরেজিতে mystic বলিতে যাহা বুঝায় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। অতীন্দ্রিয় গভীর ব্যাপার, শুধু বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া তাহা জীবনে উপলব্ধি বা উপভোগ করাই অর্থাৎ জ্ঞানকে রসে পরিণত করাই ভাবকের কাজ। বৌদ্ধগানের টীকায় (পৃঃ ৯) আমরা পাই—"ভাবক-স্যাবিরতাভিযোগঃ" ও "মহাসুখলম্পটোহং ভাবকঃ"। দুইটি বৌদ্ধ পদ গানে ভাবকতার পরিচয় খুবই পাওয়া যায়—

> এবংকার বীঅলই কুসুমিঅ অরবিন্দ
> হো মহু অররূপং সারঅবীর জিংঘই মঅরন্দ। (কৃষ্ণাচার্য)
> জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
> তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥ (গুণ্ডরীপাদ)

পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায় যে, চৈতন্যের পূর্বেও বাঙলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম ছিল, কিন্তু বৈষ্ণবতার মধ্যে ভাবকতা ছিল না। সেইজন্য চৈতন্যদেবকে

বার বার ভবক বলা হইয়াছে। অবৈষ্ণবেরা কিন্তু এই শব্দটি খুব ভাল অর্থে ব্যবহার করিত না। বৈষ্ণবদের ভাবরসময় নৃত্য ও কীর্তনাদি তখনকার সামাজিকেরা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করিত। চৈতন্যভাগবতে আছে—অবক কীর্তন করি নানা ছলা পাতে ॥ আদি ৯ অধ্যায়।

সংকীর্তন—আমরা বহুদিন হইতে বৈষ্ণবদের সংকীর্তন শুনিতেই অভ্যস্ত। বৈষ্ণবদের নিজেদেরও ধারণা ছিল যে, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের সৃষ্টি। বৌদ্ধেরা যে সংকীর্তন করিতেন তাহা তাঁহাদের রচিত পদ গান ও তাহার সুরের নাম দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তবে বৌদ্ধরা সংকীর্তন না বলিয়া সঙ্গায়ন বলিয়াছেন। বৌদ্ধ গান ও দোহায় (পৃঃ ৩১) আছে "গীতিকয়া সঙ্গায়নমঙ্গলং কুর্ব্বন্তি।" ইহা হইতে আমরা আরও অনুমান করিতে পারি যে, বাঙ্‌লার বিশেষত্বসূচক মঙ্গল গানগুলির অনুরূপ সাহিত্যিক অনুষ্ঠান বৌদ্ধরাও করিতেন।

ডাকিনী ও যোগিনী—ইহাদের নাম শুনিয়াই এখন আমরা ভয় পাই, কিন্তু আসলে ইহারা বজ্রযানের অন্তর্গত উপাসিকা বা আচার্যা। সুতরাং ইহারা যে মানুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহের কারণ নাই। ইহাদের অনেকেই সেকালের হিসাবে ধার্মিকা বা পণ্ডিতা বলিয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধ সমাজের অধঃপতনের পর হিন্দুরা ইহাদিগকে মোটেই ভাল চোখে দেখিত না, সেইজন্য পরবর্তী কালে ডাকিনীরা ডাইন ও যোগিনীরা অযান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের ইতিহাস বড়ই কৌতূহলজনক। ইহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।*

ছিনাল—এখন এই শব্দটি যেরূপ খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয় পূর্বে সেরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বজ্রযানের যে সকল যোগিনী বা উপাসিকা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত ও ভিক্ষা করিত তাহাদের একটি শারীরিক চিহ্ন ছিল নাক কাটিয়া ফেলা। এই ব্যাপার হইতে নানা কথার ও প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে (পৃঃ ৩২, ৩৩) আমরা ছিণালী শব্দ পাই, টীকায় উহার অর্থ আছে—"ছিন্ননাসিকা নাগরিকা।" এই অর্থ হইতে আমরা বুঝি যোগিনীরা শুধু উপাসিকা ছিল না, তাহাদের মধ্যে নাগরালিও প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্যই হয়ত এই শব্দটি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। অন্যত্রও এই শব্দটির সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (গণেশখণ্ড, ৩৪।১৪) আছে ছিন্ননাসিকা। বীম্‌স্‌ সাহেব ছিনাল শব্দের অর্থ করিয়াছেন ক্ষীণালয়, কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনই প্রমাণ নাই। যোগিনীরা নাক কাটিয়া

* এই আলোচনার ভূমিকা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ফেলিত বলিয়া হিন্দুর নিকট অযাত্রিক হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা হইতেই "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ" এই বাংলা প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়।

গতি—গতি শব্দের সাধারণ অর্থ আমরা সবাই জানি. কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে শিষ্য ও উপাসক অর্থে এই শব্দটি পাওয়া যায়। এই শব্দটি ঠিক ইংরেজি following শব্দের সঙ্গে মেলে। বাঙলার বৌদ্ধ শূন্যপন্থীরাই এই শব্দটিকে চালাইয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে আমরা পাই পূর্বোক্ত চারজন ধর্ম পণ্ডিতের কাহারও চার শ, কাহারও আট শ, কাহারও বার শ ও কাহারও ষোল শ গতি বা শিষ্য ছিল। চণ্ডীদাস তাঁহার কৃষ্ণকীর্তনে নিজেকে বার বার বাসলী গতি বা বাসলীর উপাসক বলিয়াছেন।

সহজ মত—সহজিয়া মত যে বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজযান হইতে আসিয়াছে তাহা এখন প্রায় সর্ববাদী সম্মত।

বৌদ্ধ দেব দেবী—এখানকার বাঙালী প্রধানত শাক্ত বা বৈষ্ণব। সুতরাং যেসব হিন্দু দেব-দেবী বর্তমানে বাঙালীর পূজা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারাই প্রথম সারিতে অবস্থিত থাকায় বৌদ্ধ দেব-দেবীদের খুঁজিয়া পাওয়াই মুস্কিল হয়। কিন্তু বাঙলার জন-সাধারণ এখনও কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ রীতিনীতি ও দেব-দেবীকে বজায় রাখিয়াছে।

বাঙলার বৌদ্ধ দেব দেবীর ইতিহাসের তিনটি সুস্পষ্ট স্তর দেখা যায়।

বুদ্ধদেবের নিজের কথা সাধারণ বাঙালীর মনেই নাই বলিলে অতিরিক্ত বলা হয় না। বাঙলা দেশে প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের মূর্তি কোথাও শিব, কোথাও চিন্তামণি ঠাকুর প্রভৃতি নামে পূজিত হয়। সুতরাং তাঁহাকে একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। তারপর, কোনো কালে বাঙালী বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকিলেও বর্তমানে তাহাদেরও কোনো স্মৃতি-চিহ্ন দুই-একটি প্রাচীন মূর্তিতে বা গ্রন্থে ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। প্রজ্ঞাপারমিতা লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, আর্যতারা, অবলোকিতেশ্বর, অক্ষোভ্য প্রভৃতির কথা মনে করাইলেও বাঙালীর এখন আর চিত্তবিক্ষেপ হইবে না। বাঙলার পল্লীগ্রামে যেখানে এইসব মূর্তির কোনোটি পূজিত হয় সেখানেই লোকে ইহাদিগকে বিষ্ণুর বা শিবের কোনো রূপবিশেষ বলিয়া মনে করে।

পাল রাজাদের সময় হইতে প্রবল বৌদ্ধতান্ত্রিকতা আরম্ভ হয়। সেই সময়-কার দেব-দেবীদিগকে আমরা এখন হয় মূর্তিতে না হয় গ্রন্থেই সাক্ষাৎ পাই। মারীচি, হেরুক হেবজ্র, বাগীশ্বরী, বজ্রযোগিনী, পর্ণশবরী প্রভৃতি এক সময়ে পূজা আদায় করিয়া ছায়াবাজির ন্যায় বাঙালীর মনের পর্দা হইতে সরিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগকেও এখন আর বাঙালী চিনিতে পারে না, আর হিন্দু দেব-দেবীর ধ্যানে ইঁহাদের মূর্তির পূজা হয়।

বর্তমান বাঙালী জনসাধারণ না জানিয়া যে সব বৌদ্ধভাবাপন্ন দেব-দেবীর পূজা করে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরাই প্রধান—

ধর্ম্মঠাকুর ও আদ্যা
নিত্যা ও বাশুলী
জগন্নাথ, বলরাম, ও সুভদ্রা
মঙ্গলচণ্ডী
শীতলা
ক্ষেত্রপাল

এইসব দেবদেবীর পূজার মধ্যে অনেকটা রহস্য আছে। ইহাদের মধ্যে লৌকিক, বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাব মিশিয়া একটি নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছে। তাই ইঁহারা হিন্দু সমাজে টিকিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিতেরা ধর্মঠাকুরকে সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি অনুসারে যে ধর্মঠাকুরের পূজা হয় তাহা বৌদ্ধভাবাপন্ন বটে, কিন্তু লাউসেনের পদ্ধতি মোটেই বৌদ্ধ নয়, উহা সূর্যের পূজা। ইহা আমি বিস্তৃতভাবে অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। বাশুলী বা বাসলী বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বাগীশ্বরী হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন মনে হয়। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের সম্বন্ধ ত এখনকার দিনে খুবই জানা কথা। বাঙালীর মঙ্গলচণ্ডীতে লৌকিক ও বৌদ্ধপ্রভাব খুবই আছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আমরা দেখিতে পাই, ব্যাধের পূজায় ও খুল্লনার পূজায় এই দুইটি স্তরই আলাদাভাবে চিত্রিত হইয়াছে। শীতলাতেও বৌদ্ধ হারীতির সম্ভব আছে অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের রক্ষকরূপে ক্ষেত্রপালের পূজা এখনও চলিতেছে।

মা গোসাই—বাঙলাতে মা গোসাই শব্দটি চলিত আছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি অনুসন্ধান করা দরকার। বাঙলা দেশে শ্রীধর্মভট্টারক বা ধর্মঠাকুর পুরুষরূপে কল্পিত, তাঁহার আবার শক্তিও আছে।

কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্মকেও পরবর্তী কালে পূজা করা হইত। এই ধর্ম সাধারণত স্ত্রীরূপেই পূজিত হন এবং তাঁহার স্ত্রী-মূর্তিই দেখা যায়। বাঙলা দেশেও এ ধারণা একেবারে লোপ পায় নাই—তাহা আমরা রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাবিধান (পৃঃ ২১২, ২১৩) হইতে জানিতে পারি। শ্রীধর্মের বাহন উলূক তাহার গোসাঞির কাছে জিজ্ঞাসা করিল—

ঘরে ঘরে পূজে কে পূজা লেই ?
কে বলায় জগতের মাই ?

ইহার উত্তরে স্বয়ং ধর্ম বলিলেন—

ঘরে ঘরে পূজি আমি পূজো লি।
আমি বলাই জগতের মাই।

এখানে স্পষ্টতঃই ধর্মগোসাঞি নিজেকে মা গোঁসাই বলিতেছেন। তারপর আবার ঐ গ্রন্থেই (পৃঃ ১৩৪) পাওয়া যায়—

শ্রী মাঞি গোশাঞের পুষ্পং জয়।

সুতরাং এই শব্দটি প্রাচীন বৌদ্ধস্মৃতি বজায় রাখিয়াছে। অথচ এখন ইহা শ্লেষযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। আমরা খড়দার মা গোঁসাই এর কথা শুনি। ইহার ভিতরকার ব্যাপার কেহ জানাইলে একটি অতীতকালের রহস্যের মূল জানা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ ব্রত উৎসব—বৌদ্ধ ব্রতের মধ্যে বর্ষাবাসের জন্য যে চাতুর্মাস্য যাপনের বিধান ছিল তাহা পরবর্তী কালে বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল দেখিতে পাই। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য-১ম পরিচ্ছেদ) আছে…

তাহাঁঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥
* * *
চাতুর্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব-সনে।
গোঙাইলা নৃত্যগীত কৃষ্ণ সংকীর্তনে॥

এখন আমরা রথযাত্রা উৎসবটিকে বিষ্ণুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত মনে করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীনকালে এ উৎসব বৌদ্ধদেরই ছিল। চীনদেশী পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়া বৌদ্ধদিগকেই এই উৎসব করিতে দেখিয়াছিলেন। এইটুকু লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে-সব স্থানে পূর্বে বৌদ্ধ-প্রাধান্য ছিল এখনও সেইসব স্থানেই রথযাত্রার খুব প্রাবল্য আছে··যথা পুরীর রথ, ধামরাই-এর রথ। আসলে রথযাত্রাটি একটি দেহতত্ত্ব রূপক; মানুষের দেহকেই রথ হিসাবে কল্পনা করা হয়। এইরূপ চিন্তা হইতে চলিত কথায় শরীরকে রথ বলা হয়।

গাজন উৎসবটি বৌদ্ধ-সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়। গাজন বলিতে পূর্বে ঠিক কি বুঝাইত এখন তাহা ঠিক ধরা যায় না। ধর্মের গাজন বোধ হয় রামাই পণ্ডিত প্রবর্তিত করেন। নরসিংহ বসুর ধর্মরাজের গীতে আছে "আদ্যের পণ্ডিত তুমি কর্যাছ গাজন।"

গম্ভীরা—এই গম্ভীরা শব্দটি কোথা হইতে আসিল তাহা মালদহের "আদ্যের গম্ভীরা" লেখক ঠিকরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। গম্ভীরা একটি উৎসবের নাম হইলেও আসলে ইহা গোপনীয় পূজাস্থানকে বুঝাইত বলিয়া মনে হয়। যেমন—"গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর।" যাহারা বাংলা দেশে বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ রশ্মিটুকু বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহারাই এই শব্দটি

ব্যবহার করিত। পরে তাহাদের নিকট হইতে বৈষ্ণবেরা ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা গোপনীয় ভজন-স্থান হিসাবে এই শব্দটি ব্যবহার করিতেন, যেমন গৌরাঙ্গ গম্ভীরা। চৈতন্য-চরিতামৃতে (অন্ত্য-১০ম পরি) আছে—

গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনে শয়ন।

গোফা—গুহা শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই খুব পরিচিত। পালি ও প্রাকৃতে ইহার বহু বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। অশোকের অনুশাসনে আছে কুভা। তার পর পাওয়া যায় গুম্ফা, যেমন হাতী গুম্ফা। তার পর প্রাচীন বাঙলায় গোফা হইয়াছে। বৌদ্ধরা বহুকাল পূর্বে পাহাড় পর্বত কাটিয়া যে মন্দির করিতেন, তাহাই গুহা নামে পরিচিত ছিল। বৈষ্ণবেরা নির্জনে সাধনের জন্য যে গৃহ নির্মাণ করিতেন তাহাকে গোফা বলা হইত। চৈতন্য ভাগবতে (আদি—১১ অঃ)—আছে।

গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জন গোফায়।

চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য—৩য় পরি) পাওয়া যায়—

গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জনে তাঁরে দিল।

এই শব্দটিই আবার মুখের কথায় ঘোপা হইয়া গিয়াছে।

স্থানের নাম—বাঙলা দেশের বহু প্রাচীন স্থানের নামের মধ্যেও বৌদ্ধ-স্মৃতি লুকাইয়া আছে মনে হয়। বঙ্গের বহু জেলাতেই "যুগীর ঘোপা" নামে পরিচিত অনেকগুলি জায়গা আছে বলিয়া জানা যায়, যেমন—টাঙ্গাইলে, দিনাজপুরে, মেদিনীপুরে। এসব জায়গা সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজখবর লওয়া হয় নাই। ইহা প্রাচীন বৌদ্ধদের আড্ডা ছিল, না নাথপন্থীদের আস্তানা ছিল তাহা আলোচিত হওয়া দরকার। অনেকে অনুমান করেন, ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীর নাম অনুসারে স্থাপিত হইয়াছিল, বাজাসন বজ্রাসন শব্দ হইতে আসিয়াছে, এবং ধামরাই ধর্মরাজিকা শব্দ হইতে উদ্ভূত। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের ফলে এবং মুসলমান আমলে বাঙলা দেশের বহু সমৃদ্ধ ও প্রাচীন স্থানের নাম বদলান হইয়াছিল, সুতরাং অনেক জায়গার পাচীন নাম এখন আর জানিবার উপায় নাই।

লোকের নাম—মানুষের নামটি শুনিয়াই অনেক সময়ে আমরা লোকের ধর্ম কি তাহা ঠিক করিতে পারি। বিশেষত প্রাচীন কালেব লোকেরা সব দেশেই ধর্মমূলক নাম রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এখন যেমন সত্যভূষণ, প্রিয়নাথ প্রভৃতি নাম দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই পূর্বে সেরূপ ছিল না। কালীচরণ, হরিচরণ, শিবচরণ প্রভৃতি ও কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা ইত্যাদি নাম দ্বারা লোকটি শাক্ত না শৈব বা বৈষ্ণব তাহা বুঝিতে মোটেই কষ্ট হইত না বৌদ্ধ আমলের মধ্যযুগের কতকগুলি নাম দেখিলেই লোকটি যে বৌদ্ধ ছিল তাহা আমরা বলিয়া দিতে পারি। ডাক্তার কর্দিয়ের তালিকা হইতে কয়েকজন বৌদ্ধ লেখকের

নাম সংগ্রহ করা গেল—কুলদত্ত, কুলেন্দু, গয়াধব, চৌরঙ্গিন, জালন্ধরি, ত্রিরত্নদাস, দানশীল, দীপঙ্কর, ধর্মপাল, ধর্মকীর্তি, পদ্মপাণি, বুদ্ধগুপ্ত, বুদ্ধদত্ত, বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী, রাহুলভদ্র, বজ্রগুপ্ত, বিনয়চন্দ্র, বিনয়দত্ত, শাক্যশ্রী, শীলেন্দ্র, সংঘদত্ত, সমন্তভদ্র, সহজবিলাস প্রভৃতি। প্রাচীন লিপির সঙ্ঘেশ গুপ্ত নামটি সুস্পষ্ট বৌদ্ধেরই নাম হইতে পারে মনে করিলে দোষের হয় না।

এখন আমরা বিনয়চন্দ্র নাম দেখিলে বৌদ্ধসংস্রব মনে আনিতে পারি না, কিন্তু আসলে নামটিতে বৌদ্ধস্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। কুলেন্দু নামটিও আমি শুনিয়াছি। গয়াধর নামটি চলিত আছে। তারপর এখন লোকনাথ নামটিতে বৌদ্ধগন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু ইহাতে যে বৌদ্ধ প্রভাব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; ডাক্তার কর্দিয়ের তালিকায় একজন লেখকের নাম অবলোকিতেশ্বর বা লোকনাথ ছিল। এখন আমরা বোধিসত্ত্বের কথা ভুলিয়া গেলেও তাহার নামটি বেশ ব্যবহার করিতেছি। এখনও কুলচন্দ্র, কুলচরণ নাম বজ্রকুলের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এখানে স্বীকার করা দরকার যে, কৌলদের নামও এরূপ হইতে পারে। তারানাথ, তারাচরণ, প্রভৃতি বজ্রতারা বা আর্যতারার সঙ্গে সম্পর্কিত কি না ভাবিয়া দেখা দরকার। এখানে একটি নাম লইয়া একটু বিশেষ আলোচনা করিলে দোষের হইবে না। উহা ঘনরাম। আমরা সবাই ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্তীর নাম জানি। অথচ ঘনরাম নামটির অর্থ কিছু আছে কি না অনেকেই ভাবিয়া দেখি নাই। এই সম্পর্কে বৌদ্ধদিগের প্রাচীন শ্রীঘন সূত্রের নাম করা যাইতে পারে। আমরা রামচরিতে বুদ্ধের একটি নাম পাই শ্রীঘন। বৌদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্তী রামচন্দ্র কবিভারতীর ভক্তি শতকে (শ্লোক নং ২২) পাওয়া যায় "শ্রীঘনং পূজয়েথাঃ।" রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা-পদ্ধতিতে পাই—"তুমি দীননাথ ঘন।" বুদ্ধের এই নামটি হইতেই ঘনরাম শব্দটি সৃষ্ট হইয়াছে। এইসব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঘনরাম নামটি বৌদ্ধ প্রভাব বহন করিতেছে।

বাঙালীর উপনাম—বৌদ্ধ আমলে লোকের নিজের নামটি মাত্র ব্যবহৃত হইত। তাহাদের পদ্ধতি বা বংশনাম কিছু ছিল কি না জানা যায় না। যাহারা পূর্বে ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতিভুক্ত ছিল তাহারা বৌদ্ধ হইলেও তাহাদের মধ্যে তফাৎ বুঝাইবার বোধ হয় উপায় ছিল না। বৌদ্ধদিগের নামগুলির মধ্যে কোনোটি শান্তি, কোনোটি শক্তি, কোনোটি মৈত্রী, কোনোটি চারিত্র্য, কোনোটি মাঙ্গল্যবাচক ছিল। এইসব ভাব প্রকাশ করিবার জন্যে অন্যান্য শব্দের মধ্যে ধর, কর, ঘোষ, দাস, গুপ্ত, মিত্র, ভদ্র, সেন, শীল, পাল, রক্ষিত প্রভৃতি নামের অংশ-রূপে ব্যবহৃত হইত। তখন কিন্তু এসব শব্দ দেখিয়া কাহারও জাতি নির্ণয় করা যাইত না। কারণ নামগুলি গুণবাচক ছিল এবং উহাতে বংশপরিচয় ছিল না। পরে দেশে পুনরায় হিন্দু প্রভাবের সময়ে একটি মাত্র নাম দ্বারা জাতি

বুঝান যায় না বলিয়া আলাদা উপনাম বা বংশনাম দরকার হইয়া পড়ে। অথচ বহুদিন পরে কাহারও আর পূর্বের জাতির কথা মনে ছিল না। তখন বৌদ্ধ অবস্থার নামের পূর্বলিখিত অংশগুলিই আলাদা করিয়া লইয়া নূতন করিয়া বংশনামের সৃষ্টি হইয়াছিল কিনা তাহা খোঁজ করিয়া দেখা আবশ্যক। এখানে অবশ্য আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, গুপ্ত, সেন, রক্ষিত প্রভৃতি শব্দগুলি সাময়িক উপাধি হিসাবেও ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে সে-হিসাবে এগুলির প্রয়োজন ছিল না। তাহারা ধর্মার্থেই এগুলির প্রয়োগ করিত। ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু সমাজে বৌদ্ধগণ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলে ব্রাহ্মণের সপক্ষতা বা বিপক্ষতা অনুসারে সমাজে উচ্চ বা নীচ স্থান পাইয়াছিল এবং তদনুযায়ী তাহাদের পদ্ধতিরও স্থান গণ্য করা হইত।

যে সব প্রাচীন শব্দ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতেও বৌদ্ধ প্রভাব ছিল। চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে আমরা বাজুল শব্দটি পাই। ইহা বজ্রকুল হইতে উদ্ভূত। বজ্রকুল = বজ্জউল = বাজুল। এই গ্রন্থেই আবার বাজিল নাচের কথা পাওয়া যায়—উহা বজ্রধরদিগের নৃত্যকে বুঝাইত। এইরূপে ধর্মপূজার ব্যাপারে বারমতি ও আমনি প্রভৃতি শব্দ লুপ্ত হইয়া গেলেও বৌদ্ধস্মৃতির সঙ্গে ইহাদেরও সম্পর্ক আছে।

এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বাংলা ভাষার মধ্যে যেসব শব্দে বৌদ্ধদিগের স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে তাহার সম্বন্ধে অতি সাধারণ গোছের আলোচনা করা গেল। ইহাতে কোন কোন জায়গায় পূর্ব পূর্ব মতের সঙ্গে মিল নাই দেখা যাইবে। আশা করি, পণ্ডিত ব্যক্তিরা আলোচনা করিয়া বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন। এইরূপ আলোচনা হইলে আমরা যে শুধু বাংলা ভাষার ইতিহাসের একটা দিক পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পারিব তাহা নহে, প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজের ভিতরকার কথাও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

(প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩)

চৈত্য

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

বৌদ্ধদের পূজার বস্তু স্তূপ ইত্যাদিকে চৈত্য বা চেতিয় বলে। চৈত্য বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র। তাহারা দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া শ্রদ্ধানত শিরে চৈত্যবন্দনা করে। বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সেই চৈত্য দেখিয়া তাহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ যুগ-যুগান্তর-রচিত বনগহনের মধ্য হইতে চৈত্য আবিষ্কার করিয়া আপনার কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। চৈত্য-দর্শনে ভাবুকের মন ভাবমগ্ন হয় এবং কবির কল্পনার উৎস খুলিয়া যায়।

বাস্তবিক চৈত্যসমূহ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চরমোন্নতির নিদর্শন এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের প্রধান সামগ্রী। অর্থ-কথা-রচয়িতার রচনায় আমরা চারি প্রকার চৈত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই যথা—'শারীরিক', 'পারিভোগিক', উদ্দেসিক' ও 'ধর্মচেতিয়'। পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেল, বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর যে স্তূপসমূহ নির্মিত হইয়াছিল, সেইগুলিই শারীরিক চেতিয়; পারিভোগিক চেতিয় তাঁহারই ব্যবহার্য-দ্রব্য-রক্ষণের জন্য নির্মিত মন্দির; তাঁহার মূর্তি ইত্যাদি উদ্দেসিক চেতিয় এবং ত্রিপিটক গর্ভস্তূপই ধর্ম-চেতিয়।

তাহা ছাড়া বুদ্ধ ঘোষের বিনয় ও মধ্যম নিকায়ের অর্থকথায় আর একপ্রকার চৈত্যের উল্লেখ আছে, যাহা পদ-চৈত্য বলিয়া কথিত হয়। সেই পদ-চৈত্য-বন্দনায় বৌদ্ধ মন্দিরে নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারিত হইয়া থাকে—

> "যং নম্মদায় নদিয়া পুলিনে চ তীরে
> যং সচ্চবন্ধগিরিকে সুমণাচলগ্গে
> যং চাপি যোনক পুরে মুনিনো চ পাদং
> তং পাদলঞ্ছনমহং সিরসা নমামি।"

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁহার দেহাবশিষ্ট লইয়া অজাতশত্রু প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল। তখন ব্রাহ্মণাচার্য দ্রোণ তাহা আট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া লব্ধ ধাতুর উপর স্তূপ নির্মাণ করাইয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে যে যে স্থানে তথাগতের ধাতু স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানগুলির নাম এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি:—

১	রাজগৃহ	৫	রামগ্রাম
২	বৈশালী	৬	বেঠদীপ
৩	কপিলবস্তু	৭	পাবা
৪	অল্লকপ্প	৮	কুশীনগর

ইহাদের স্তূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ এখন দুর্লভ। প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া ইহাও বলা আবশ্যক, বুদ্ধের দশন ধাতু চতুষ্টয় স্বর্গ, গান্ধারপুর, দন্তপুর (কলিঙ্গপুর) ও নাগপুরে পূজিত হইত। তাঁহার ৪০টি সমদন্ত, কেশ, লোম ইত্যাদির প্রত্যেকটি প্রত্যেক চক্রবালে নীত হইয়াছিল।

কলিঙ্গপুর বা দন্তপুরের দন্ত ধাতুর বিবরণ দাঠাবংশে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাহা পুনঃ সিংহলের অনুরাধাপুরে স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার একশত বৎসর পরেও চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়াং তথায় তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। গান্ধারপুরের দন্ত ধাতুর ইতিহাস অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। ফা-হিয়াং-এর বিবরণে এইমাত্র জানিতে পারা যায়, যে তিনি নাগরায় এক দন্ত ধাতুর স্তূপ দেখিয়াছিলেন। বামিয়ান, নববিহার প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার দন্ত-ধাতু-দর্শনের উল্লেখ আছে। হিন্দনগরের এক স্তূপে তথাগতের তথাকথিত উষ্ণীষ ধাতু (মাথার খুলি) নিহিত ছিল। তথায় আরও দুইটী মন্দিরে উষ্ণীষ ধাতুর অংশ ও চক্ষুতারা পূজিত হইত।

দক্ষিণ দেশবাসী বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধধাতু যে কম ছিল, তাহা নহে। দন্ত ধাতু ছাড়া বুদ্ধের অন্যান্য ধাতুও সিংহলে নীত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, তথাকার স্বর্ণমালী চৈত্যে ১ * দ্রোণ বুদ্ধধাতু নিহিত। অশোকের সময়ে তরুণ শ্রমণ সুমণ বুদ্ধের দক্ষিণ কণ্ঠাস্থি সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার উপর তিষ্য মহারাম চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বুদ্ধের প্রধান শিষ্যগণের শরীরাবশেষও অতি সম্মানের সহিত স্তূপে নিহিত হইত। ফা-হিয়াং বৈশালীর অনতিদূরে আনন্দ স্থবিরের অর্দ্ধ-শরীরাবশেষের স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অপরার্দ্ধ শরীরাবশেষটী মগধে পূজিত হইত। শারীপুত্র, মৌদ্গলায়ন, রাহুল ও উপালি প্রভৃতি স্থবিরগণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য মথুরায় তাঁহাদের দেহাবশেষের উপর বৃহৎ বৃহৎ স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সংঘ-স্থবির মহাকাশ্যপের দেহাবশেষ কুক্কুটপাদ বলিয়া কথিত পর্বত কন্দরেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বুদ্ধের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে তাঁহার ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহ কোথায় কি ভাবে রক্ষিত ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারতভ্রমণের সময়েই তাঁহাদের পরিদৃষ্ট পরিভোগিক চৈত্যের আভাষ মাত্র পাই। ফা-হিয়াং নাগরার কাছে বুদ্ধের ১৬।১৭ হাত দীর্ঘ চন্দনযষ্ঠি দেখিয়াছিলেন। তৎসন্নিহিত এক মন্দিরে বুদ্ধের সংঘাটি নিহিত ছিল। হুয়েন সাং তাহাতে সংঘাটি ও কাষায় দুইটিই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

---

* দ্রোণ পরিমাণ বিশেষ। ৪ গণ্ডূষে ১ পল্ব, ৪ পলে ১ আলুহক, ৩ আলুহকে ১ দ্রোণ বা দ্রোণ।

ফা হিয়াং-এর সময়ে তথাগতের পাত্র পেশোয়ারে রক্ষিত ছিল। সেই পাত্র-পূজার জন্য দলে দলে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইত। দুই শতাব্দী পরে তাহা পারস্যরাজের হস্তগত হইয়াছিল। দীপবংশ নামক গ্রন্থে নানা প্রকার পারিভোগিক চৈত্যের উল্লেখ আছে, যথা—ককুসন্ধের পানীয়পাত্র, কোণাগমনের কায়বন্ধন, কাশ্যপের স্নানবসন ও গোতমের কটিবন্ধন। এইগুলি কায়বন্ধন স্তূপেই নিহিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণভারতের এক বৌদ্ধমঠে কুমার সিদ্ধার্থের উষ্ণীষ রাখা হইয়াছিল। তাহা প্রত্যেক উপোসথদিনে দেখান হইত।

যাহার ছায়ায় বুদ্ধের বুদ্ধত্বের বিকাশ হইয়াছিল, সেই সুপ্রসিদ্ধ বোধিতরুও পারিভোগিক চৈত্য বলিয়া পরিগণিত। বৌদ্ধদের বোধিতরুর পূজা অতি পুরাতন। বোধগয়ায় অশোকের একাধিক বার তীর্থযাত্রাই ইহার প্রমাণ। বরহুতের ভাস্কর্যে ছয় জন বুদ্ধের ছয়টি বোধিবৃক্ষ দেখা যায়। বোধিবৃক্ষ-সমূহের জন্মস্থান গয়া, কারণ বৌদ্ধদের মতে ইহা বুদ্ধগণের জন্মভূমি ও পৃথিবীর কেন্দ্র। মহাবংশে কথিত আছে, মৌর্যযুগে অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা বোধিতরুর দক্ষিণ শাখা সিংহলে লইয়া গিয়া মহামেঘবনারামে রোপণ করিয়াছিলেন। তাহারই বীজ নানা স্থানে অঙ্কুরিত হওয়ায় সিংহলের সর্বত্র বোধি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আগে বুদ্ধের প্রতিমা গড়িয়া তাঁহার পূজা করার প্রথা প্রচলিত ছিল না। এমন কি বরহুত ও সাঞ্চির ভাস্কর্যেও তাহার আভাস পাওয়া যায় না। শুধু কোন কোন স্থলে চিহ্ন, পদচিহ্ন ও চক্রের দ্বারা বুদ্ধ-রূপের সূচনা হইত।

বরহুতের একস্থানে দেখা যায়, মহারাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের পদচিহ্নের সম্মুখে নতজানু হইয়া আছেন। অতএব আরও নানা কারণে ইহা প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধপ্রতিমূর্তি-নির্মাণ অশোকের পরবর্তী যুগেই হইয়াছিল। প্রতিমা-পূজার আরম্ভ সম্বন্ধে প্রবাদ-বাক্যের অভাব নাই। কিন্তু যাচাই করিয়া তাহাদের সত্যতা নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। যদি মথুরার বুদ্ধ ও মহাবীরের মূর্তি শিলালিপি অনুসারে শকাব্দের বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রতিমা-পূজার আরম্ভ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই বলিতে হইবে। যাহাই হউক না কেন, ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন যে, খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে অথবা তাহার অনতিকাল পরেই বুদ্ধমূর্তি-নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল।

পরিব্রাজক ফা-হিয়াং সাঙ্কাশ্যে দশ হাত উচ্চতাবিশিষ্ট এক বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন। তাহা হুয়েন্ সাংএরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি পেশোয়ারে কণিষ্কের স্তূপের অনতিদূরে ১৮ হাত উচ্চ মর্মরগঠিত আর এক বুদ্ধমূর্তি দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তাহা রাত্রিতে স্থান ত্যাগ করিয়া স্তূপের চারিদিকে ভ্রমণ করিত। বেনারসের সারনাথেও ধর্ম-

চক্রদেশনা-রত বুদ্ধের এক পিত্তল-প্রতিমা বিরাজমান ছিল। পরিনির্বাণ-শয্যায় শায়িত অবস্থায় নির্মিত বুদ্ধমূর্তির একাধিকবার উল্লেখ আছে। বামিয়ানে সেই অবস্থার এক প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি ছিল। তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার ফুট। কুশীনগরের শালবনের মধ্যে এই অবস্থার আর একটি মূর্তি হুয়েন সাং-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের প্রতিমূর্তিও নির্মিত হইত। অনেক স্থলে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার পূর্ববর্তীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। অতীত বুদ্ধ অপেক্ষা ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়ের পূজা সংস্কার অনেক বেশী। তাঁহার এক সুবৃহৎ সুবর্ণ-বর্ণ-মূর্তি উদ্যাননগরে বিরাজমান ছিল। ইহার উচ্চতা ৯০ হাত। প্রবাদ আছে, এই মূর্তিগঠনের আগে শিল্পী এক অর্হৎ শ্রমণের ঋদ্ধি-সাহায্যে স্বর্গে পৌঁছিয়া মৈত্রেয়ের দেহাবয়ব দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই প্রতিমার পূজার জন্য নানা দেশীয় রাজগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত।

উত্তর দেশীয় বৌদ্ধগণের বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের সম্মান মৈত্রেয়ের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। ফা-হিয়াং-এর বিবরণে জানা যায়, তাঁহার ভারত-ভ্রমণের সময়ে মথুরায় প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের পূজা প্রচলিত ছিল। দুই শত বৎসর পরে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখনও কাপিশা, উদ্যান, কাশ্মীর, কনৌজ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মঞ্জুশ্রীর আধুনিক মূর্তি চারি হস্তবিশিষ্ট। তাঁহার আর একটি মূর্তি যবদ্বীপে ১২৬৫ শকাব্দে আদিত্যবর্মন্ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। তাহা এখনও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। ধ্যানী বুদ্ধগণের দেবত্বারোপের পর হইতেই তাঁহাদের তারা ও পুত্রগণের মূর্তি গঠন আরম্ভ হয়। ধ্যানী বুদ্ধগণের আকার প্রায় বুদ্ধের মত। পদ্মাসন নানা বাহনবিশিষ্ট। এই মূর্তিসমূহ বহুল-ভাবে দাঁড়ান অবস্থায় নির্মিত।

ধর্মচৈত্যের বিশেষ কোন বিবরণ নাই। শুধু মথুরায় কয়েকটি ধর্মচৈত্য ছিল। বলা বাহুল্য, সেইগুলিতে ত্রিপিটক নিহিত ছিল।

পালি গ্রন্থে কেবল চারিটি পদচৈত্যের উল্লেখ আছে। সেইগুলি যথাক্রমে নর্মদা-তীর, সত্যবদ্ধ পর্বত, সুমন পর্বত ও যবনপুরে প্রতিষ্ঠিত। পদচৈত্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

এক সময়ে সুপ্পারক পত্তনের বণিক সম্প্রদায় পদচৈত্যের এক মনোরম চন্দন-বেদী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বুদ্ধ নিমন্ত্রিত হইয়া সেই বেদীগ্রহণের জন্য তথায় উপনীত হইলেন। তথা হইতে ফিরিবার সময়ে তিনি নর্মদার তীরে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিলেন। তখন নর্মদাবাসী নাগ নর্মদার বিস্তীর্ণ

বারিবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া জল কল্লোলে নদীসৈকত প্লাবিত করিয়া তথাগতের চরণে লুটাইয়া পড়িল। করুণাময় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারই অনুরোধে নর্মদাতীরে আপনার পদাঙ্ক রাখিয়া গেলেন। সেই হইতেই তাহা নরনাগের পূজার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

সত্যবন্ধ স্থবিরের অনুরোধেই সত্যবন্ধ পর্বতশিখরে বুদ্ধের পদচিহ্ন চিহ্নিত হইয়াছিল।

তথাগত সিংহলে নাগরাজ মণি অক্ষিকের বাসভবনে আপনার আহার গ্রহণ করিয়া তথাকার সুমণ-পর্বতশৃঙ্গে (বর্তমানে এ্যাডম্‌স্ পিক্) পদচৈত্য চিহ্নিত করিয়াছিলেন। সুমণ পর্বত এখন সাধারণের মহাপুণ্যতীর্থ। তীর্থযাত্রীগণের আনন্দধ্বনিতে তাহার দেহ নিরন্তর মুখরিত। এই পদচিহ্ন লইয়া এক বিষম সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। ইহা শৈবদের শিব পদাঙ্ক, বৌদ্ধদের শ্রীপাদ ও মুসলমানগণের আদম্-পদচিহ্ন-রূপে নানা ধর্মাবলম্বীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ও প্রস্থ ২½ ফুট।

আশ্চর্য্যের বিষয়, যবনপুরের পদচৈত্যের বিশেষ কোন কাল্পনিক কিংবা ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। পালি গ্রন্থে উক্ত পদচৈত্য ছাড়াও অন্যান্য পদচৈত্যের বিবরণ দুর্লভ নহে। ঋষিপত্তনে (সারনাথে) গৌতমের পূর্ববর্তী চারি জন বুদ্ধের পদচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। হুয়েন সাং স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেই পদাঙ্কের দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুট ও গভীরতা ৭ ফুট। ইহার তুলনায় যাহা তিনি পাটলিপুত্রের সমীপবর্তী স্থানে দেখিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। উদ্যান প্রভৃতি স্থানেও অনেক পদচৈত্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। নেপালীদের মঞ্জুশ্রী পাদুকা ও পদচৈত্য অভিন্ন।

বাস্তবিক পদচৈত্যের উৎপত্তির ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, বৌদ্ধদের পদচৈত্য-পূজা বিষ্ণুপাদের পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের তীর্থপর্যটনের সময়ে সমগ্র দেশ চৈত্যময় ছিল। এখনও তাহাদের ধ্বংসাবশেষ অংশিকভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। হুয়েন সাং একাধিক বার ভারতের চৈত্য ও বিহার-সমূহের ধ্বংসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পেশোয়ারের স্তূপ তাঁহার ভারতভ্রমণের পূর্বে তিন বার দগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উচ্চতা ৪০০ হাতেরও অধিক। কণিষ্কের রাজত্বকালে এই স্তূপের ভিত্তিস্থাপন হয়। মানিকিয়ালার স্তূপও প্রায় ইহার সমসাময়িক। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ইহাও বলা আবশ্যক, পুষ্কলাবতীর সন্নিহিত স্তূপদ্বয় অশোক নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তথায় আরও দুইটি স্তূপ ছিল। তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হুয়েন সাং-এর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মের উভয় শাখায় প্রবাদ আছে যে, ভারতে অশোকের ব্যয়ে নির্মিত ৮৪০০০ স্তূপ ছিল। পরিব্রাজকগণ আরও বলেন, তথাগতের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে নির্মিত ধাতুস্তূপগুলি খুলিয়া ধাতুসমূহ অশোক উক্ত ৮৪০০০ স্তূপে নিধান করিয়াছিলেন? কেবল রামগ্রামের স্তূপই অনুন্মুক্ত ছিল।

বেনারসের সমীপবর্তী সারনাথে কতকগুলি স্তূপ ও বিহার ছিল। সেই-গুলি সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এখনও তাহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কপিলবস্তুতেও কয়েকটি স্তূপ ছিল। মধ্যযুগে মগধ স্তূপময় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সিংহলের স্তূপসমূহের মধ্যে মহাস্তূপই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। লংকেশ্বর দুষ্টগামনীর রাজত্বকালে অনুরাধাপুরে এই স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। ফা-হিয়াং-এর উক্তিমতে ইহার উচ্চতা ৩০০ হাত। তাহারই পার্শ্বে সিংহলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অভয়গিরি বিহার বিরাজমান ছিল। তথায় যূপরাম, জেতবনা-রাম প্রভৃতি আরও অনেক চৈত্য এখনও তাহাদের পুরাতন সৌন্দর্যের চিহ্ন লইয়া দর্শককে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিতেছে।

চৈত্যপূজার প্রাচুর্যে ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের কতই যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। চৈত্যপূজা ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চৈত্যপূজার ভিতর দিয়া ভারতের যে শিল্প-গৌরব অর্জিত হইয়াছিল তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

[প্রবর্তক, আষাঢ় ১৩৪১]

ভিক্ষু-সঙ্ঘ-সংগঠন

অনাগারিক শীলানন্দ সূত্রবিশারদ্

'অমৃত দুন্দুভি' বাজাইয়া ধর্মচক্র-প্রবর্তনের জন্য শাক্যমুনি যেইদিন কাশীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতে নূতন যুগের সূচনা হইয়াছিল: ভাবের নূতন উৎস খুলিয়াছিল; কর্মের নূতন প্রবাহ ছুটিয়াছিল। সেই মঙ্গলময় দিবস সুদূর অতীতের বুকে মিশিয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতি মানব-সভ্যতার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা গৌরবোজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

বুদ্ধদেবের সেই দিনের অপূর্ব ধর্ম-চক্রদেশনা পঞ্চ-ব্রাহ্মণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিল। সত্যের আলোকে তাঁহাদের মোহ-নিশার অবসান হইল। জ্ঞানগণের প্রভাবে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'ভিক্ষুগণ! এসো, ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হও, সত্যের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত।'

এই বাণীই ছিল পঞ্চ ব্রাহ্মণের দীক্ষামন্ত্র এবং সঙ্ঘ-সংগঠনের মূল ভিত্তি। নব-দীক্ষিত পঞ্চ ভিক্ষু লইয়া প্রথম সংঘ রচিত হইল। দিন কয়েক পরে বারাণসী শ্রেষ্ঠীর একমাত্র সন্তান যশ ও তাঁহার বন্ধুগণ বুদ্ধের* 'এহি' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সঙ্ঘের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তিন মাসের মধ্যে সঙ্ঘের ভিক্ষু-সংখ্যা ষাটে দাঁড়াইল। বর্ষা কাটিয়া গেল। শরৎ নূতন সুর লইয়া দেখা দিল। পাখীর কলতানে ও কৃষকের আনন্দগানে মাঠের শ্যামলিমা উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিল। বুদ্ধদেব যেন শরতের সুরে সুর মিলাইয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন—

"চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেব মনুস্সানাং দেসেথ ভিক্খবে ধর্মং আদি কল্যাণং মজ্ঝে কল্যাণং পরিযোসান কল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবল পরিপুন্নং পরিশুদ্ধং ব্রহ্ম-চরিযং পকাসেথ।"

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, সর্বজীবের মঙ্গল-বিধানের জন্য দেশ-দেশান্তর বিচরণ করিয়া কল্যাণময় বাণীর প্রচার কর, নির্মল পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের মহিমা-কীর্তনে রত হও।

* সঙ্ঘ সংস্থাপনের প্রারম্ভে বুদ্ধদেব 'এহি' অর্থাৎ 'এসো' বলিয়া পাপীকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেন। তখন সঙ্ঘ প্রবেশের অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারিত হইত না।

এই বাণীকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভিক্ষুগণ 'জনহিতায়' 'জন-সুখায়' দেশ দেশান্তরে ছুটিলেন। বুদ্ধ স্বয়ং উরুবেলাভিমুখে চলিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তিনি এক বনে তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম লইলেন। বনভূমি মধ্যাহ্নের কোলে গভীর সুষুপ্তিমগ্ন। তরুলতা সূর্য-কিরণ স্নাত হইয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মাথার উপরে শরতের শুভ্র মেঘ স্তব্ধ হইয়া আছে। হঠাৎ দূরশ্রুত আলাপধ্বনি বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বুদ্ধের কানে পৌঁছিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। ত্রিশ জন ভদ্রবর্গীয় তরুণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের ব্যগ্রতাপূর্ণ মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া তথাগত স্নেহ-সরল বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎসগণ! তোমরা কি চাও?"

তাহারা কহিল—"প্রভো, আমরা এক বারবিলাসিনীর সহিত এই বনে আসিয়াছি, সে আমাদের অজ্ঞাতসারে আভরণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে, আমরা তাহারই সন্ধান করিতেছি।"

তাহাদের উত্তর শুনিয়া তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—"বৎসগণ এই বিশাল সংসারারণ্যে তোমরা নিজের সন্ধান না করিয়া পরের সন্ধান করিতেছ কেন?"

তরুণের দল এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। চিত্রার্পিতের মত তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ভগবানের আরও বিচিত্র উপদেশ শুনিয়া তাহারা আত্মসন্ধানের জন্য আকুল হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ভিক্ষা চাহিল। তিনি তাহাদিগকে 'এহি' মন্ত্রে বরণ করিয়া লইলেন। এইবার সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা ষাট পার হইয়া নব্বই হইল।

ভগবান তথা হইতে পদব্রজে উরুবেলায় পৌঁছিলেন। তাপস-সঙ্ঘে তাঁহার আগমনে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সঙ্ঘ-নায়ক কাশ্যপ নিজেই অতিথি সেবার ভার লইলেন। অভ্যাগতের বাক্যে ও ব্যবহারে সঙ্ঘ-নায়কের হৃদয় জুড়াইয়া গেল। সঙ্ঘ-নায়ক ভাবমুগ্ধ হইয়া তাঁহার বাণী শুনিতেন। এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে কাশ্যপ আপনার শিষ্যদের লইয়া সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সহোদর গয়াকশ্যপ ও নদীকশ্যপ সশিষ্যে তাঁহার অনুবর্তী হইলেন। তখন সঙ্ঘে ভিক্ষুসংখ্যা সহস্রাধিক হইল। ভগবান তাঁহার নববিনীত শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে আসিলেন। সেই গিরি-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত রাজগৃহ আজ বুদ্ধের নূতন বলিয়া বোধ হইল। সত্যের সন্ধানে রাজগৃহে আসিয়া যেইদিন বিম্বিসারের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, সেইদিনের রাজগৃহ আর আজিকার রাজগৃহ যেন এক নয়—তাঁহার আগমনে সেইদিনের রাজগৃহ কৌতূহলপূর্ণ, আজিকার রাজগৃহ জনতার আনন্দ-ধ্বনি প্লাবিত।

ভগবান তাঁহার নববাণী প্রচার করিয়া রাজগৃহবাসীর প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। বিম্বিসার প্রমুখ বহু লোক তাঁহার গৃহী-শিষ্যশ্রেণীতে ভর্তি

হইলেন। আবার অনেকে সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। সেই হইতে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের গ্রাম নিগম রাজধানী ভ্রমণ করিয়া কল্যাণময় বাণীর প্রচার আরম্ভ করিলেন। যতই তাঁহারা অগ্রসর হইলেন, ততই সঙ্ঘের কলেবর বৃদ্ধি পাইল। ভগবানের বাণী ভাবের এমন উন্মাদনা বহিয়া আনিল যে, যাহারা শুনিল তাহাদের অনেকেই জনক-জননীর স্নেহকাতর বুক শূন্য করিয়া, পতি-প্রাণা পত্নীর হৃদয়ে চিরবিরহের বহ্নি জ্বালাইয়া, সন্তানকে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন ঘরে ঘরে নিদারুণ কান্নার রোল পড়িয়া গেল। কেহ পুত্রশোকে কাঁদিল, কেহ ভ্রাতৃশোকে কাতর হইল; পতিবিরহে কাহারও মুখ নিদাঘ-তপ্ত ছিন্ন ফুলের মত শুকাইয়া গেল। মহাশ্রমণের অত্যাচার লোকের আর সহ্য হইল না। তাহারা মুণ্ডিত-মস্তক দেখিয়া ভয় পাইতে লাগিল। কখনও কখনও রক্তবর্ণা গাভীর মূর্তিও তাহাদের দেহ কণ্টকিত করিয়া দিত। তাহারা প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল—"অপুত্তকতায় পটিপন্নো সমণো গোতমো, বেধব্যায় পটিপন্নো সমনো গোতমো।" অর্থাৎ 'শ্রমণ গৌতম লোকের বংশলোপের জন্য নারীদের অকাল-বিধবা সাজাইবার জন্য এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।' তখন বুদ্ধের নাম শুনিলে লোকের শরীর কাঁটা দিয়া উঠিত। তাঁহার প্রতি লোকের দ্বেষ ও ভয়ের অবধি রহিল না। তথাপি সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। বৌদ্ধদের কল্পিত সমগ্র মধ্যদেশ শ্রমণের পীতবাসের আভায় যেন পীতাভ হইয়া উঠিল। এইরূপে বুদ্ধদেব নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সঙ্ঘ সংগঠন করিয়া লইলেন।

ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, তরুণ বৃদ্ধ সকলেই সঙ্ঘে সমানাধিকার পাইয়াছিল। নানা নদী যেমন সমুদ্রকে পাইয়া তাহাতে বিলীন হয় এবং তাহাদের নাম রূপ সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া সমুদ্র নামে কথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নানা কুলাগত শ্রমণগণও সঙ্ঘের অঙ্গীভূত হইয়া আপনাদের নাম গোত্র বিসর্জন দিয়া সক্যপুত্তিয় সঙ্ঘ নামেই অভিহিত হইতেন। তাঁহারা গৃহি-জীবনের উচ্চ নীচতা ভুলিয়া পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ-স্থাপন করিতেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতার বিচার বর্ণ, বিদ্যা কিম্বা সাধনা লইয়া নয়, সঙ্ঘ প্রবেশের তারিখ লইয়াই। আনন্দ, ভদ্দিয় প্রভৃতি শাক্যকুমারগণ যখন তাঁহাদের নাপিত উপালিকে লইয়া ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন বুদ্ধ তাঁহাদের গর্ব খর্ব করিবার জন্য প্রথমেই উপালিকে দীক্ষাদান করিলেন। শাক্যকুমারগণ সঙ্ঘের মহিমামুগ্ধ হইয়া আভিজাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া উপালির চরণে প্রণত হইলেন। সেই অবধি তাঁহারা উপালিকে জ্যেষ্ঠ ভাবিয়া সম্মান-প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সঙ্ঘ জ্যেষ্ঠতর সদস্য কনিষ্ঠকে স্নেহপূর্ণ 'আবুসো' সম্বোধন করিতেন এবং কনিষ্ঠ আপনার জ্যেষ্ঠকে 'ভন্তে' অথবা 'আয়ুষ্মা' সম্বোধন করিতেন।

সঙ্ঘপরিচালনার জন্যই বিনয়ের নিয়মগুলি সুসংবদ্ধ হইয়াছিল। যৌন-সম্মিলন, গুরুতর চুরি, নরহত্যা ও আপনার অভূত সিদ্ধির পরিচয় এই চারি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলে ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং পুনঃ সঙ্ঘ-প্রবেশের অধিকার হারাইয়া ফেলে। কতক গুরু নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ভিক্ষুকে দণ্ডিত হইতে হয়; আবার কতক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দোষ মুক্ত হয়। এই সব ছাড়া আরও অনেক রকমের বিনয় ও কর্ম তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বুদ্ধকেই তাঁহারা নেতা মানিয়া চলিতেন। বুদ্ধের আদেশ তাঁহাদের অলঙ্ঘনীয়। নিম্নোক্ত শ্লোকই তাহার প্রমাণ—

পাতিমোক্খং বিসোধেন্তো অপ্পেব জীবিতং চজে
পঞ্ঞত্তং লোকনাথেন—ন ভিন্দে শীলসংবরং।

'অর্থাৎ দেহে প্রাণ থাকিতে বুদ্ধ নির্দেশিত শীল-সংবর ভঙ্গ করিবে না।' বুদ্ধদেব তাঁহার অন্তর্ধানের পূর্বে তাঁহার প্রচারিত বাণীকেই সঙ্ঘের নেতৃপদ প্রদান করিয়াছিলেন - "যো বো আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চয়েন সত্থা।" অর্থাৎ 'আনন্দ! আমার অবর্তমানে আমার প্রচারিত ধর্ম বিনয়কেই তোমরা তোমাদের গুরু বলিয়া জানিবে।' সুতরাং তাঁহার পরিনির্বাণের পর ধর্মবিনয় সঙ্ঘের নেতৃপদে বৃত হইল।

আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনই ছিল সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। পরোপকার-ব্রত সঙ্ঘের লক্ষ্য-বহির্ভূত ছিল না। আপনার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া জনসাধারণের নৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা সঙ্ঘের কর্ম-জীবনের অন্যতম অধ্যায়। তাই সঙ্ঘ রাজা-প্রজা, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভারতে সঙ্ঘের দান অপরিমেয়। তাহা আমরা স্বীকার করি বা না করি, কিন্তু সত্য তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগে এমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সঙ্ঘ সংগঠনের প্রথা কোথাও প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধের সঙ্ঘসংগঠনের প্রণালী ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম। সেই আদর্শেরই অনুকরণে সেই যুগেও নানা সঙ্ঘে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও সেই অনুকরণ-যোগ্য আদর্শ বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যায় নাই, তাহা যুগে যুগে নব নব ভাবে সঙ্ঘ-সংস্থাপকদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। [প্রবর্তক, ভাদ্র ১৩৪১]

সাঞ্চী

নগেন্দ্রনাথ সোম

সাঞ্চীতে ভারতের প্রধান বৌদ্ধস্তূপ বিরাজিত। এইটি সকল স্তূপ অপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত।

ভূপাল হইতে বেলা চারিটার ট্রেনে সাঞ্চীর স্তূপ দেখিতে যাত্রা করিলাম। দূরত্ব মোটে আটাশ মাইল। দেড় ঘণ্টায় রেল পেঁছে। যদি ফিরিবার ট্রেনের সুবিধা থাকিত তাহা হইলে স্তূপ দেখিয়া অনায়াসে ভূপালে রাত্রি দশটার মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া আহারাদি করিয়া শয়নে পদ্মলাভ করিতে পারা যাইত। কিন্তু সে সুবিধা নাই। আমার পক্ষে রাত্রি সাড়ে চারিটার ট্রেনে প্রত্যাগত হওয়াই সঙ্গত, তাহা হইলে ভূপালে ভোরে পেঁছিতে পারা যায়। সাঞ্চীতে থাকিবার কোন সুবিধাজনক স্থান নাই, কেবল ভূপালের বেগমের নির্মিত একটি ডাক বাংলা আছে—খাদ্যদ্রব্যের কোন ব্যবস্থা নাই—ক্ষুদ্র স্টেশন—কিছুই বিক্রয় হয় না, পুরি মিঠাই ত আশার অতীত: একটি পান-বিড়ি-সিগারেট ওয়ালাও নাই।*

কাজেই ভূপাল স্টেশনে কিঞ্চিৎ জলযোগ (মিষ্টান্ন পুরী ডালমুট জিলাপী) সমাপন করিয়া, রাত্রিতে অনাহারে সাঞ্চী স্টেশনে একখানি বেঞ্চে অলস্টারের উপর মলিদা মুড়ি দিয়া শয়নের কল্পনা করিয়া—অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় জি, আই, পি, রেলে, (পূর্বে ইহা 'Indian Midland Railway' নামে অভিহিত ছিল) ভূপালের উত্তরপূর্ব সাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই আটাশ মাইল পথের শোভা বড়ই মনোরম। ট্রেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল—কিছুক্ষণ পরেই পাহাড় আরম্ভ হইল—বড় পাহাড় নহে। ছোট ছোট উঁচু নীচু লম্বা চওড়া নানারকমের স্তূপ স্তূপ শৈলমালা ঘেরিয়া আসিতে লাগিল। এ সকল পাহাড়ে বড় বড় গাছ নাই—কিন্তু আবার অনাবৃতও নহে। শ্যামল গুল্মরাজিতে সমাচ্ছন্ন ছোট ছোট ঝোপঝাপে ঢাকা—গাঢ় সবুজ রং; মনে হইতে লাগিল যেন পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘখণ্ড আকাশ হইতে ভূতলে খসিয়া পড়িয়া পথের দু'ধারে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দৃশ্য বড়ই চমৎকার—বড়ই বাহার খুলিয়াছে—শ্যামায়িত তরঙ্গায়িত ধরিত্রীর নীল শোভায় চক্ষু জুড়াইয়া যাইতে লাগিল—এ স্থানটি যেন প্রকৃতির নিকুঞ্জকানন (Gnove of Nature)। দূর-দূরান্তর শ্যামল পাদপরাজিতে সমাচ্ছন্ন। শ্যামল, হরিৎ, নীল শোভা

---

* বর্তমানে এসব অসুবিধা নেই।—বর্তমান সম্পাদক।

চতুর্দিকে বিস্তারিত। ক্রমে অল্পে অল্পে সন্ধ্যার স্তিমিত ছায়া প্রসারিত হইতেছে—বিটপীশিরে দিনান্ত কিরণের স্বর্ণাভা কৃষ্ণ হরিতে মিশ্রিত হইয়া বিচিত্র মৃদু দীপ্তি ফুটাইতেছে—শীতের বেলা, দিন ছোট—অপরাহ্ণ অন্ধকার ও আলোক মিশ্রিত! ট্রেন চলিতেছে: প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে সহসা নেত্রপথে ও কি দৃশ্য প্রকটিত হইল! শৈলশৃঙ্গোপরি ও কি শোভা পাইতেছে! অপূর্ব তোরণ-সমন্বিত সাঞ্চীর বৌদ্ধস্তূপ ওই গিরিশিখরে বিরাজিত! ঈষৎ অন্ধকার-মিশ্রিত আলোকে ট্রেন হইতে স্তূপের দৃশ্য বড়ই বিচিত্র-দর্শন!—স্তূপের দূর দৃশ্যে হৃদয়ে যেমন অননুভূত আনন্দের সঞ্চার হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বড় ভয়ও হইতে লাগিল।—স্তূপ ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইলেরও কিঞ্চিৎ অধিক, তদুপরে আবার পাহাড়ের উপর অবস্থিত দেখিতেছি—যদি ঘোর সন্ধ্যা হইয়া যায় তাহা হইলে কি প্রকারে বনপথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ে উঠিব? আমি একাকী—আমার সঙ্গে বন্ধু বা ভৃত্য কেহই নাই—শুনিয়াছিলাম এ অঞ্চলে ব্যাঘ্র ও অন্য বন্য জন্তুরও ভয় আছে। জনমানবশূন্য বনপ্রান্তর—নিকটে কোন ক্ষুদ্র গ্রামও নাই; ষ্টেশন মাষ্টার যদি সাহায্য না করেন, সঙ্গে যদি কোন লোক অনুগ্রহ করিয়া না দেন, তাহা হইলেইত সকল আশা বৃথা হইল। এত ক্লেশ স্বীকার কি পণ্ড হইয়া যাইবে! যা করেন ঈশ্বর! পথিকের সহায় তিনি, এই ভাবিয়া নীরবে পাহাড়ের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া চলিলাম—ক্রমে সাঞ্চী ষ্টেশনে ট্রেন আসিয়া পেঁছিল।

ষ্টেশন প্লাটফরমে অবতরণ করিলা এদিক ওদিক চাহিতেছি, এমন সময় দেখি কোট প্যান্টুলন ও মস্তকে মলিদার টুপী পরিহিত একটি সৌম্য দর্শন ভদ্রলোক যষ্টিহস্তে দাঁড়াইয়া আমার দিকে দেখিতেছেন। আমারও তাঁহার দিকে দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, ইনি আমাদের দেশীয় লোক হইবেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়ের কি নাম? তিনি বলিলেন, 'শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়।' মহাশয়ের নিবাস? 'বালি'। এ কথা শুনিবামাত্র আমার আপাদমস্তক হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া হইয়া উঠিল—তখন আনন্দে আমার মনে যে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে লিখিয়া বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয় আমি সাঞ্চীস্তূপ দেখিতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, 'চলুন আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি—অগ্রে আমার তাঁবুতে যাইয়া চা পান করিয়া লউন", —পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "না, অগ্রে দেখিয়া আসিয়া পরে চা পান করিবেন, কারণ সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে।" আমি বলিলাম—তা বেশ, স্তূপ দেখিতে পারা যাইবে ত? পাহাড়ের উপরে অবস্থিত দেখিতেছি। তিনি বলিলেন, "আমরা প্রথমে একটি সোজা পথ দিয়া পাহাড়ে উঠিব—বেশী বড় পাহাড় নয়—আমি লইয়া যাইতেছি চলুন।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে

লইয়া চলিতে লাগিলেন—ষ্টেশনের কিয়দ্দূরে কয়েকটি শুভ্র শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে।—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরল নিজ কর্মচারিগণের সহিত এই বিশাল স্তূপের সংস্কার কার্য্য পরিদর্শনে আসিয়াছেন—পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার হেড ক্লার্ক।—আমরা চলিতে চলিতে ক্রমে শৈলের মূলদেশে উপস্থিত হইলাম। গিরি আরোহণ করিতে লাগিলাম—চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে দুইজনে কথাবার্তা হইতে লাগিল। চড়াই কষ্টকর নহে—সরল ঈষৎ ঢালু পথ পাহাড়ের বৃক্ষবিটপের মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়াছে—ক্রমে আমরা সেই জগদ্বিখ্যাত স্তূপের তোরণ সমীপে আসিয়া উপনীত হইলাম—দেখিলাম ডাইরেক্টর জেনেরল স্বয়ং স্তূপের কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। পাঁচুবাবু বলিলেন "সাহেব এখনও যায় নাই দেখছি, আপনি ঐ দিকটা দেখিয়া আসুন—আমি এ দিকে অপেক্ষা করিতেছি—আপনি ঘুরিয়া আসিলে আপনাকে অন্যান্য অংশ দেখাইব।" আমি কর্মজীবনের সাহেবভীতি বুঝি—তাঁহার ন্যায়সঙ্গত কথার অনুবর্তী হইয়া স্তূপ দেখিতে গেলাম—তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন।

প্রকাণ্ড গম্বুজের ন্যায় বিরাট্ স্তূপের চতুর্দিক্ অপূর্ব-সুন্দর প্রস্তর নির্মিত রেলিংএ পরিবেষ্টিত। এরূপ রেলিং আর কোথাও দেখি নাই। রেলিংএর উচ্চতা ছয় ফুটেরও অধিক হইবে। যেন মোটা মোটা প্রস্তর জুড়িয়া এই অনন্য সুন্দর বৃত্তাকার পরিবেষ্টনী নির্মিত হইয়াছে। চারিদিকে চারিটি অপূর্ব শিল্পশোভাখচিত তোরণ; এরূপ তোরণ আর কোথাও নাই। চিত্র না থাকিলে কাহারও সাধ্য নাই যে লিখিয়া বর্ণনা করিয়া, ইহার গঠন ও শিল্প সৌন্দর্য্য বুঝাইতে পারে!—সচরাচর যেরূপ সমচ্ছে দ্বার বা খিলান-সমন্বিত তোরণ দৃষ্ট হয়, এই চারিটি তোরণের তাহাদের সহিত কোন সৌসাদৃশ্যই নাই। চারিটি তোরণের গঠন প্রণালী একই প্রকার তবে শিল্পচাতুর্য বিভিন্ন রকমের। প্রথমে সংক্ষেপে একটি তোরণের গঠন-প্রণালী বুঝাইতেছি, অপর তিনটির গঠনও সেইরূপ। দুইটি শিল্পশোভাখচিত চতুষ্কোণ স্তম্ভ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; শীর্ষদেশে তিনটি পাড়ের ন্যায় চতুষ্কোণ লম্বা প্রস্তর সমান্তরাল ভাবে পর পর সংলগ্ন হইয়া আছে। এই চতুষ্কোণ প্রস্তরগুলির সর্বাঙ্গে, বুদ্ধলীলাবিষয়ক ও জাতকের নানা চিত্রাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব তোরণের স্তম্ভদ্বারের উপরিভাগে হস্তিযূথ পৃষ্ঠোপরে পূর্বোক্ত অপূর্ব খিলান-সদৃশ শিল্পসম্ভার বহন করিতেছে। দক্ষিণ তোরণের স্তম্ভোপরি মর্কটাকার স্থূলোদর, ক্ষুদ্রপদ, স্ফীতগণ্ড, দৈত্যমুণ্ডাকৃতি মনুজগণ ক্ষুদ্র হস্তযুগ উত্তোলন করিয়া দীর্ঘশিল্পভার ধারণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অপর তোরণদ্বয়ের শোভাও বিচিত্র গঠনের কৃশ-স্থূল আকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যে মনোহারী। বুদ্ধদেবের অগণ্যলীলার চিত্রের বর্ণনার স্থান নাই। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী, অপ্সর অপ্সরা যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব, কিন্নর, লতা, ফুল, পাতা প্রভৃতি যে কত রকমের শিল্প-

চাতুর্য্য তোরণ চতুষ্টয়ে সমলঙ্কৃত, তাহা আর কি বর্ণনা করিব। কত প্রকারের শোভাযাত্রা চলিয়াছে—স্বর্গ হইতে দেবকন্যাগণ অবতরণ করিয়া বুদ্ধের নানা-বিষয়িণী লীলা অবলোকন করিতেছেন, এইরূপ অসংখ্য চিত্রভূষিত শিল্পসৌন্দর্য দেখিয়া তোরণের নিম্ন দিয়া পরিবেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। বিশাল বৃত্তাকার বেদিকার উপর স্তূপ অবস্থিত। বেদিকার ব্যাস ১২০ ফিট। উচ্চতা চৌদ্দ ফিট এবং স্তূপের (বৃত্তাকার) চতুষ্পার্শ্বের বেদিকার প্রশস্ততা ৬ ফিট। স্তূপের ব্যাস ১০৬ ফিট, উচ্চতা ৪২ ফিট। ইহা ইষ্টকপ্রস্তরে গ্রথিত, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। কালের পীড়নে শৈবাল তৃণগুল্মে সমাচ্ছাদিত হইয়াছে—স্থানে স্থানে জীর্ণ ভগ্ন—কিন্তু সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—শীঘ্রই নবশ্রী ধারণ করিবে।

দুই তিনবার স্তূপরাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইহার উত্তর পশ্চিম কোণে অপর আর একটি ছোট স্তূপ দেখিলাম। ইহার দশা অতিশয় শোচনীয়, সংস্কৃত হইতেছে। এই স্তূপটি দেখিয়া পর্বতের একপার্শ্বে আসিয়া দেখি, পাঁচুবাবু আমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পর্বতের দক্ষিণদিকের কিঞ্চিৎ নিম্নপ্রদেশে আরও একটি প্রস্তর বেষ্টনীবেষ্টিত স্তূপ দেখাইলেন—ইহার পরিবেষ্টনীর শিল্পসৌন্দর্য্যের যে কি বাহার তাহা আর কি বলিব! ইহাতেও নানা বৌদ্ধশিল্প অপূর্ব নৈপুণ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছে। মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম! শৈলচূড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে—সে দিকে দৃক্‌পাত নাই—প্রফুল্লচিত্তে শিল্প-শোভাই দেখিতেছি। এমন সময় অপরিচিতের মাঝে চিরপরিচিত বন্ধু বলিলেন, "মহাশয়, সন্ধ্যা হইয়াছে, পাহাড় হইতে নামুন—এই দিকে পাহাড়ে অধিরোহণ ও অবরোহণ করিবার সোপান, স্বচ্ছন্দে অবতরণ করুন।" নামিতে নামিতে পূর্বোক্ত স্তূপের কিয়দ্দূরে একটি প্রকাণ্ড পাথরের বাটি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার এক-পার্শ্ব আবার ভাঙিয়া গিয়াছে—এর চেয়ে বড় পাথরের বাটি আমরা দুর্গে দেখিয়াছি। এইটি কিন্তু কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত।

এতদ্ব্যতীত নামিতে নামিতে আরও স্থানে স্থানে নানা বৌদ্ধকীর্তির ভগ্নাবশেষ ও নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। পাহাড়ের উপর হইতে নিবিড় ঘনাচ্ছাদিত শৈলশ্রেণীর মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। এ অঞ্চলের চতুর্দিকে বৌদ্ধকীর্তি রাজা অশোকের সময় নির্মিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলের বহু বর্গ মাইল ভূভাগ ব্যাপিয়া অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। সাঞ্চীর ৬ মাইল দূরে সোনারী গ্রামে ৮টি; সোনারীর ৩ মাইল দূরে সা-দারায় ১টি; সাঞ্চীর ৭ মাইল দূরে ভোজপুরে ৩৭টি; ও ভোজপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে ৩টি স্তূপ আছে অবগত হইলাম। কিন্তু এই সাঞ্চীর স্তূপই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা মনোহারী। সাঞ্চী হইতে ৬

মাইল দূরে ভুবনমোহিনী বিদিশালক্ষণার দিগন্তপ্রথিতা রাজনগরী সুদূর অতীতের ঘন ঘোর ভূকম্পনে ভূপ্রোথিতা হইয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের উপর হইতে দৃশ্য মনোরম—দূরে বেত্রবতী রজত তরঙ্গে প্রবাহিতা। এই নগরী সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে, সম্পদে, প্রাসাদে, পণ্যবীথিকায়, হর্ম্যমালায়, সরোবরে, উদ্যানে, রথ্যায় বৈজয়ন্তপুরীকেও পরাজিত করিয়াছিল। বৌদ্ধবিহার, মঠ, মন্দির, সৌধ, অলিন্দ, তোরণ, প্রাচীব প্রস্তর, স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য, সংঘারাম, বেদিকা, গুহা, গুম্ফা, প্রভৃতির স্বর্গীয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিল। এই স্থানে বেত্রবতী নদী প্রবাহিতা। কালিদাসেব মেঘদূতের যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে উদিত মেঘকে অলকাভিমুখে প্রেরণ করিবার সময় এই স্থানের কীর্তিকলাপ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া যাইতে কাতর অনুরোধ করিয়াছিল। এই স্থানের বর্ণনায় যক্ষ এইরূপ বলিয়াছিলেন—"দশার্ণের রাজধানী বিদিশা। উহাব যশে ভুবন ভরিয়া আছে। * * তুমি তথায় বেত্রবতীর জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। বেত্রবতী নদী, সুতরাং তোমার রসরঙ্গিণী, সে বিদিশার পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; উহার জল চলিতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে লাফাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন কোন প্রৌঢ়া কামিনী মুখে ভ্রূভঙ্গী করিয়া তোমায় ডাকিতেছে। সুতরাং সে জল পানে তোমার মুখে চুম্বনের ফল হইবে।" তাহার পর মহাকবি কালিদাস যক্ষের মুখ দিয়া মদ্‌বর্ণিত স্থানেব বর্ণনা করিয়া বলাইতেছেন, "সেখানে গিয়া তুমি নীচ (সাঁচি) নামে সহরতলীর পাহাড়ে বাসা লইও। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পুরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে তাহার পুলক কদম্বফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টি কূর্মপৃষ্ঠ, ৩০০।২০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইহা বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধসংঘারামে বিমণ্ডিত।"

সন্ধ্যা হইয়াছে—স্বচ্ছ অন্ধকার কাননতলে লুকোচুরি খেলা খেলিতেছে। আমি কবিত্বপূর্ণ প্রদেশে কবিত্বময়ী শোভা উপভোগ করিতে করিতে বন্ধুর সঙ্গে নামিয়া আসিয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলাম।

তাঁবুতে আসিয়াই চা'র ব্যবস্থা হইল। শুধু কি চা! তাঁহার অফিসের আর একটি বাবু কাশী হইতে উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা, লাড্ডু, খাজা প্রভৃতি অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন তাহা চা'র সঙ্গে দুই তিনটি প্রদত্ত হইল। রাত্রে রুটী তরকারী দুগ্ধ ও আবার সেই অমৃতোপম উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রভৃতি আহার। আমি তাঁবুতে ঘণ্টা দুই তিন বিশ্রাম করিবার পর, একটি লোকের হস্তে হরিকেন ল্যাম্প দিয়া পাঁচু বাবু আমাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার দুই খানি বেঞ্চ জুড়িয়া শয্যা রচনা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন, বিদেশী অতিথি সমাগত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা অধমকে প্রদান করিয়া, নিজে ভূতলে শয়ন করিলেন। আমি স্বীকৃত না হইলেও তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন

না। এই অতিথিবৎসল প্রবাসিগণের আতিথেয়তা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম। কি ভাবিয়া আসিতেছিলাম, আর এখানে বিধাতার ইচ্ছায় কি ঘটিল! জনপ্রাণীহীন অরণ্য-প্রান্তর সুখালয়ে পরিণত হইল! অতি ভোরে যখন চারিদিক অরুণের রক্তরাগে রঞ্জিত হয় নাই, তখনও নিবিড় অন্ধকার অরণ্যে খেলিতেছিল। আমিও অলষ্টারের উপর বালিদা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলাম। ঘোর শীত, কনকনে ঠাণ্ডা, জল জমিয়া বরফে পরিণত হইবার উপক্রম। কাক কোকিল বিহঙ্গকুলের কাহারও সাড়া নাই। এইভাবে আমি বেলের শব্দে জাগিয়া উঠিলাম। গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, আমিও বিদায় গ্রহণ করিলাম। প্রবাসে অনেক সুখস্মৃতির মধ্যে এটিও আমার চিত্তে চিত্রের ন্যায় প্রতিফলিত থাকিবে।

[সাহিত্য, মাঘ ১৩২১]

সারনাথের প্রাচীন নাম

সারনাথে আধুনিক ভূ-খননকার্য্য না হইলেও ঐ স্থানের অনেক কথা জানা যাইতে পারিত। তবে "সারনাথ" এই নামে পুঁথি পাঁজি খুঁজিলে কোনই প্রাচীন সংবাদ মিলিত না। কারণ, বৌদ্ধ সাহিত্যে 'সারনাথ' নাম পাইবার উপায় নাই। সর্ব্বত্রই উহার প্রাচীন নাম—**ইষিপতন মিগদায়** উল্লিখিত হইয়াছে। (১) এই নাম দুইটির উৎপত্তি লইয়াও নানা গোল আছে। আমরা নৈয়ায়িক মহাশয়দের তর্ক লইয়া হাসি তামাসা করি, কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের প্রায় সমস্ত কঠিন বিষয়ই যে মহা তর্কসঙ্কুল। তাহাতেও 'অনুগম নিগম' করিতে হয়, হেত্বাভাস' (fallacy), 'ছল সংশয়', 'উপমানানুমান' প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয়। মনে হয়, ভাল করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের সংস্কার না লইয়া প্রত্নতত্ত্বে যাইতেই নাই। যাইলে নানারূপ হাস্যকর 'থিয়োরি' লোকের বিশ্বাস টলাইয়া দিতে থাকে। এই ধরুন, অশোকানুশাসনের ব্যাখ্যা বিচার লইয়া বুলর, সেনার ফ্লীট্, ভিনিস কতই না মাথা ঘামায়াইছেন—কিন্তু এখনও কোন আপোস হয় নাই ত!

'ইসিপতন' নামের মূল, এইবার আলোচ্য। খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে লিখিত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু'তে এইরূপ আছে :—"দ্বাদশ বৎসরান্তে, বোধিসত্ত্ব 'তুষিত ভবন' হইতে অবতীর্ণ হইবেন। 'শুদ্ধাবাস' দেবগণ জম্বুদ্বীপস্থ প্রত্যেক বুদ্ধগণকে (২) সংবাদ দিলেন, 'বোধিসত্ত্ব অবতীর্ণ হইবেন, তোমরা বুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর।" অতঃপর ঐ সকল প্রত্যেক বুদ্ধ নিজের নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করিয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বারাণসী হইতে অর্দ্ধ যোজন দূরস্থ

---

(১) বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত এই নামের একটা ধারাবাহিক আলোচনা "Some literary references to the Isipatna" নামে "Indian Antiquary" 1916, April সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেটি দেখিতে পারেন।

(২) বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের ভাষায় "পচ্চেক বুদ্ধ" "সম্মাসমবুদ্ধ" (সম্যক্-বুদ্ধ) নহেন। কারণ, বুদ্ধের সম্যক্ সংবুদ্ধরূপে আবির্ভাবের নিমিত্ত একটি বিশেষ তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল।—Buddha by Dr. H. Oldenberg p. 120. footnote

মহাবনে পঞ্চশত প্রত্যেক বুদ্ধ বাস করিতেন। (৩) তাঁহারা সকলে পৃথক পৃথক ভাবে ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ পূর্বক নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের স্ব স্ব মাংস-শোণিতময় দেহ তেজোধাতুর দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া গেল। শরীরগুলি ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিপতিত হইল। ঋষিগণ এখানে পতিত হইয়াছিলেন, অতএব ইহার নাম হইল 'ঋষিপতন'।"—ফরাসী পণ্ডিত সেনার (E. Senart) ঋষিপতন হইতে যে 'ইসিপতন' নাম হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন যে এই নাম ব্যতীত আরও দুইটি নাম জ্ঞাত হওয়া যায় যথা, ঋষিপত্তন ও ঋষি-বদন। তাঁহার মত এই যে পূর্বে সারনাথের নাম ঋষিপত্তনই ছিল, কালক্রমে তাহা অপভ্রংশ হইয়া ঋষিপতন হইয়াছে। (৪) আমাদেরও মনে হয় যে সেনারের মতই যুক্তিযুক্ত। কারণ, মহাবস্তুতেই লিখিত হইয়াছে যে প্রত্যেক বুদ্ধগণের পতনের পূর্বে বারাণসীর অর্দ্ধ যোজন দূরে তাঁহারা মহাবনে বাস করিতেন। আর তাঁহারা একটি দুটি নন, যখন পঞ্চশত জন একত্র বাস করিতেন, তখন উক্ত স্থান ঋষিগণের একটি পত্তন ছিল, ইহা অস্বাভাবিক নহে। পত্তন হইতে বদন অপভ্রংশ হওয়া শব্দশাস্ত্রের অনুকূল ব্যাপার। প্রাকৃতের "পো বঃ" "তো দঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা "প স্থানে "ব" এবং "ত" স্থলে "দ" হইয়া থাকে। (৫) সুতরাং ঋষিপতন কোনো সময়ে ঋষিবদনরূপে উচ্চারিত হইত। মহাবস্তুতেও "ঋষিবদনে"র উল্লেখ পাওয়া যায়, তথা "ঋষিবদনস্মিং" (৪৩,৩০৭ পৃঃ) "ঋষিবদনে মৃগদাবে" (৩২৩,৩০৪ পৃঃ) আবার ইহাতে "ঋষি পত্তনে"ও উল্লেখ আছে (৩৬৬, ৬৮ পৃঃ)। ললিতবিস্তরের গাথাতেও এই নাম উক্ত আছে।

---

(১) প্রাচীন পালিগ্রন্থাদি হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে যখন সম্যক সংবুদ্ধগণ অবতীর্ণ হন নাই অথবা তাঁহাদিগের দ্বারা কোন ধর্মসংঘ স্থাপিত হয় নাই তখনই "প্রত্যেক বুদ্ধগণ" আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ("Apadana" [illegible] the Pitaka Mss.)। কিন্তু, পরবর্তী গ্রন্থাদি হইতে বুঝা যায় যে "প্রত্যেক বুদ্ধগণ যে শুধু সেই সময়েই বর্তমান ছিলেন। কারণ বুদ্ধ বলিয়াছেন, সমগ্র বিশ্বে আমাব্যতীত প্রত্যেক বুদ্ধগণের তুল্য কক্ষ আর কেহ নাই।"

(২) চীন দেশীয় গ্রন্থে ও দিব্যাবদানে ও "ঋষিবদন" উক্ত হইয়াছে। Divyav. [illegible] 3। ইৎসিঙ্গ (I-tsing) ঋষিপতনকে ঋষির পতনরূপে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ফাহিয়ান নিঃসন্দেহে বলিয়াছেন যে এটী প্রত্যেক বুদ্ধই "ঋষিপতন" এই নামকরণের প্রণেতা।

(৫) সিদ্ধ হেমচন্দ্র (ব্যাকরণ)।

এইবার সারনাথের প্রাচীন নামের অপর অংশ—"মিগদাব" বা মিগদায়" লইয়া বিচার। এই সম্বন্ধে সুবিখ্যাত "নিগ্রোধ মিগ-জাতকে"র (৬) অনুরূপ একটি উপাখ্যান মহাবস্তুতেও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে বারাণসীর রাজার নাম ছিল ব্রহ্মদত্ত। মৃগদাবের সব মৃগ ধ্বংস হইবে বলিয়া মৃগাধিপতি নাগ্রোধের আত্মোৎসর্গের ফলে, তিনি মৃগগণকে নির্ভয়ে বিচরণের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। তাই মহাবস্তুতে উপাখ্যানের অন্ত ভাগে আছে :—

"মৃগাণাং দয়ো দিন্ন মৃগদায়েতি ঋষিপত্তনো।" মৃগদিগকে দান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম হইল "মৃগদায় ঋষিপত্তন।" (৭) এখন জিজ্ঞাসা স্বতঃসিদ্ধ—'দায়' শব্দের কোন্ অর্থটী এস্থলে প্রযোজ্য হইবে, দান অথবা বন? Childers এর পালি অভিধানে 'দায়" শব্দের "বন" অর্থেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেনার বা অন্য কোন বৈদেশিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা শুদ্ধ এই নাগ্রোধ মৃগের আখ্যায়িকাটি কি কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়া নানা প্রাচীন গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারই একটা বিশদ ইতিহাস দিয়াছেন। (৮) আমাদের মনে হয় এস্থানের সর্বপ্রাচীন নাম ছিল—মৃগদাব (বন)। বহুমৃগের বিচরণ ক্ষেত্র বলিয়া সম্ভবত ইহার এই সংস্কৃত নাম হইয়া থাকিবে। আশ্চর্যের বিষয়, এখনও এস্থান কাশীরাজের "রমনা" নামে প্রসিদ্ধ। কালক্রমে উচ্চারণ দোষে স্বাভাবিক প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে এই শব্দ "মিগদায়" রূপে পরিণত হয়। তখনও সম্ভবত ইহার "বন" অর্থই প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ বুদ্ধদেব তখনও এখানে আগমন করেন নাই

---

(৬) Jataka I, [illegible] pp এটী সারনাথপ্রসঙ্গে হুয়েঙসাঙ-এর বিবরণেও উল্লিখিত হইয়াছে।

(৭) মহাবস্তু vol I p [illegible]6 ইচিঙ (Itsing) এবং অন্যান্য চীনদেশীয় লেখকগণ মৃগদায়ের অনুবাদ করিয়াছেন "শিনয়ে" বা শিনয়ুলিন" অর্থাৎ মৃগদিগকে প্রদত্ত বনভূমি।

(৮) Benfey's Panchatantra p 18[illegible]. Also in the Memoirs of Hiuen-t-siang (1. [illegible]6. I) Jatak 1 14[illegible]-p.

জেনারেল কানিংহাম ভরহুতের উৎকীর্ণ চিত্রে এই ঘটনার চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই চিত্রের সঙ্গে "ইসিমিগজাতকম্" —এই লিপিও সংযুক্ত আছে। কিন্তু ডাঃ হর্ণলি সাহেব আবার "Indian Antiquary" তে কানিংহামের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বা পালিসাহিত্য সৃষ্ট হয় নাই। পরে যখন বুদ্ধদেবের সংসৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়েরই এক একটা উপাখ্যান রচনা করিবার যুগ আসিল, তখন এই "ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন" স্থান বা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের আদি ভূমি সারনাথও ন্যগ্রোধ মৃগজাতকের ঘটনাস্থল হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় হইতে "দায়" শব্দের প্রাচীন অর্থ বিলুপ্ত হইল এবং "দায়" দান অর্থেই এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যে সর্বত্র ব্যবহৃত হইতে লাগিল। (৯)

---

(৯) সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডি, আর, ভাণ্ডারকর ও অধ্যাপক ডাঃ এ, ভিনিস মহোদয় আমার এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

—লেখক

[মানসী ও মর্মবাণী, ভাদ্র ১৩২৩]